সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় নীতিমালা

রাফিজা রহমান
শাহেলা আক্তার

ম্যাস্-লাইন মিডিয়া সেন্টার

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ভূমিকা

বাংলাদেশে সংবাদপত্রের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। বর্তমানে দেশে দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক সবমিলিয়ে কয়েক হাজার পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে নিয়মিত বা অনিয়মিতভাবে। সংবাদপত্রের সাংবাদিক বা সংবাদকর্মীর সংখ্যাও বেড়েছে আগের তুলনায় অনেক। সবকিছুর সাথে পত্র-পত্রিকার প্রকাশনা মানও ভালো হয়েছে। এসেছে নানা বৈচিত্র। সংবাদপত্রের বিভিন্ন বিভাগ, পাতার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি এখন আলোচিত হচ্ছে বিশেষজ্ঞ মহলসহ সাধারণ পাঠক পর্যন্ত।

সংবাদপত্রের এরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ পাতা হলো সম্পাদকীয় পাতা। এ পাতাটি পাঠকদের বিশেষ করে সচেতন পাঠকদের প্রভাবিত করে থাকে। কারণ যেকোন ইস্যুর ওপর তথ্যের সাথে সাথে মতামতও দেয়া হয় এ পাতায়। পিআইবি-তে কর্মরত রাফিজা রহমান ও শাহেলা আক্তার পত্রিকার সম্পাদকীয় পাতাটির নানা দিক বিচার-বিশ্লেষণ করে এই বইটি রচনা করেছেন। একটি ভিন্ন অথচ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর এ দু'জন তরুণ লেখিকার আগ্রহকে ধন্যবাদ জানাতে হয়। সংবাদপত্রের পাঠক, সাংবাদিক, গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞ, সংবাদপত্রের সম্পাদক এবং প্রায় সকল স্তরের কর্মীসহ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ছাত্র-ছাত্রীদেরও বইটি কাজে লাগতে পারে। বইটির প্রকাশনা ও মুদ্রণের দায়িত্ব নিয়েছেন জগদীশ সানা ও এ এইচ এম মিজানুর রহমান। গ্রাফিকস্ এর কাজ করেছেন মোহাম্মদ জাকির হোসেন, বর্ণ-বিন্যাসের কাজ করেছেন শরীফ আহম্মেদ ও শাহ মোহাম্মদ গোলাম রহমান মজনু। বইটি যাদের উদ্দেশে লেখা হলো তাদের উপকারে লাগলে আমাদের সকলের শ্রম স্বার্থক হবে।

কামরুল হাসান মঞ্জু
নির্বাহী পরিচালক
ম্যাস্-লাইন মিডিয়া সেন্টার

www.pathagar.com

www.pathagar.com

গ্রন্থকারদের কথা

ক্রমবর্ধমান পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে বর্তমান সমাজ। নিয়ত পরিবর্তনশীল এ সমাজের সত্যিকার চিত্র তুলে ধরছে সংবাদপত্র। সমাজের দর্পণ হিসেবে সংবাদপত্রের পরিচিতি সংবাদপত্রের সূচনাকাল থেকেই। সে পরিচিতি থেকেই সমাজের উত্থান-পতন, বিশ্বের চালচিত্র গণমানুষের কাছে তুলে ধরছে সংবাদপত্র।

সংবাদপত্রের একটি উল্লেখযোগ্য পাতা সম্পাদকীয় পাতা। এটি পত্রিকার একমাত্র জায়গা যেখানে সংবাদপত্রের আদর্শ ও নীতি-প্রতিফলিত হয় মানুষের কাছে। একই সাথে পাঠকের চিন্তা-চেতনারও প্রকাশ ঘটে এই পাতায়। অথচ গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয় নিয়ে আজ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় ব্যাপক ও বিশ্লেষণধর্মী কোনো বই প্রকাশিত হয়নি।

এ বিষয়টি চিন্তা করে সাংবাদিক সমাজ এবং সাংবাদিকতা শিক্ষার সাথে জড়িত ব্যক্তিদের কথা মাথায় রেখেই আমরা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ হাতে সম্পাদকীয় নীতিমালা বিষয়ে কিছু লেখার উদ্দেশ্য নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিলাম। লিখতে লিখতে দেখলাম অনেক কিছু লেখা হয়ে গেছে। আরও কিছু লিখলে একটি বইয়ের আকার দাঁড়িয়ে যায়। এ পর্যায়ে আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠ সহকর্মী সাজ্জাদ কাদির পরামর্শ দিলেন লেখাটিকে বই হিসেবে প্রকাশ করার। তার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি তার দিক-নির্দেশনাপূর্ণ উপদেশের জন্যে। এছাড়া পিআইবি'র অন্য সহকর্মী যারা আমাদের নিয়ত উৎসাহ প্রদান করেছেন তাদের প্রতিও রইল আমাদের কৃতজ্ঞতা। কম্পিউটার কম্পোজের শাহ মোহাম্মদ গোলাম রহমান মজনু ও শরীফ আহম্মেদ কে জানাচ্ছি ধন্যবাদ। সংশোধিত কপি বারবার তারা হাসিমুখে প্রিন্ট করে দিয়েছেন। সেজন্য সত্যিই আমরা কৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি পিআইবি'র সহকারী লাইব্রেরিয়ান নমিতা আকতারের প্রতি। সর্বোপরি ম্যাস্-লাইন মিডিয়া সেন্টারের নির্বাহী পরিচালক কামরুল হাসান মঞ্জু-র প্রতি রইল আন্তরিক শুভেচ্ছা আমাদের বইটি প্রকাশ করার জন্য। এছাড়া এমএমসি-র প্রকাশনা কর্মকর্তা জগদীশ সানা-র পরামর্শ না পেলে বইটি আদৌ বের হতো কিনা সন্দেহ। তিনি বইটির কলেবর বৃদ্ধি ঘটিয়েছেন নিজের হাতেই। সম্পাদনা করেছেন সযত্নে। এমনকি নামটিও তার দেয়া। বিশেষ ধন্যবাদ জানাতে চাই এমএমসি-র প্রশিক্ষণ বিভাগ প্রধান মীর মাসরুর জামান-কে। তিনি এমএমসি-র প্রশিক্ষণের উপকরণ হিসেবে বইটিকে প্রকাশের পরামর্শ দিয়েছেন।

সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় নীতিমালা বইটি আমাদের প্রথম প্রয়াস। সময় স্বল্পতার কারণে অনেক তাড়াহুড়ো করে বইটি প্রকাশিত হচ্ছে। এ কারণে হয়তো কিছুটা ভুল-ভ্রান্তি থেকে যাচ্ছে। অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। বইটি কতটুকু সফল তার বিচারের ভার রইলো পাঠকদের ওপর। তবে সম্পাদকীয় নীতিমালা বিষয়ে প্রথম বাংলা ভাষায় লেখা বই হিসেবে বইটি কিছুটা হলেও সাংবাদিক সমাজকে উপকৃত করবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

রাফিজা রহমান • শাহেলা আক্তার

www.pathagar.com

www.pathagar.com

উৎসর্গ

বাংলাদেশের সাংবাদিকদের

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় নীতিমালা ---------- ১১
• অভ্যন্তরীণ বিষয় • মালিকানা • সংবাদপত্র যেখানে সম্পত্তি • প্রকাশক সমিতি • সম্পাদক কর্তৃক নিয়ন্ত্রণ • বাইরের কারণসমূহ • দলীয় অবস্থান • গোষ্ঠীস্বার্থ • পাঠকের আদর্শ • প্রতিযোগিতা • অর্থনৈতিক চাপ এবং ভর্তুকী • সম্পাদকীয় কাউন্সিল

সম্পাদকীয় পাতার বিষয়বস্তু ---------- ২২
• সম্পাদকীয় • সম্পাদকীয় গুরুত্ব • সম্পাদকীয়-এর ধরন • লিডার ও লিডারেট •বিনোদনমূলক সম্পাদকীয় • উদ্বুদ্ধমূলক সম্পাদকীয় • সময় বা কালনির্ভর সম্পাদকীয় • চিঠিপত্র • সংবাদপত্র কেন চিঠি প্রকাশ করে • চিঠিপত্র কলামে কারা লেখেন • চিঠি প্রকাশযোগ্য করে তোলা • চিঠিপত্র কলাম এবং সম্পাদকীয় নীতিমালা • নাম ও ঠিকানা • নামের সত্যতা যাচাই •বিষয় নির্ধারণ • চিঠির আকার ও দৈর্ঘ্য • চিঠি সম্পাদনা • সম্পাদকের নোট • সিন্ডিকেট কলাম • কলাম বাছাই করা • সিন্ডিকেট কলামের আকার • কার্টুন • সম্পাদকীয় পাতায় কার্টুন ব্যবহার কতটা প্রয়োজনীয় • কার্টুন নির্বাচন • উপ-সম্পাদকীয় • বিশেষজ্ঞদের সাক্ষাৎকার (অধ্যাপক সাখাওয়াত আলী খান ও হাবিবুর রহমান মিলন)।

সম্পাদকীয় লেখার কলা-কৌশল ---------- ৪৬
• বিষয় নির্বাচন করা • উদ্দেশ্য এবং পাঠক স্থির করা • বলার ভঙ্গী নির্ধারণ • বিষয় নিয়ে গবেষণা করা • সাধারণ একটি কাঠামো তৈরি করা • সম্পাদকীয়ের সূচনা বা শুরু • সম্পাদকীয়ের অবয়ব • দিক-নির্দেশনা • ধরণ • উপসংহার • ভালো লেখার নয়টি ধাপ • সম্পাদকীয় পাতার লোকবল • জটিল দিন • সম্পাদকীয় মিটিং • সম্পাদকীয় লেখক নিজেকে কিভাবে তৈরি করবেন • সম্পাদকীয় লেখকের গুণ

সম্পাদকীয় লেখনীর তথ্য-উৎস ---------- ৫৮
সংবাদপত্র • সম্পাদকীয় পাতা • অন্যান্য পত্রিকা ও বইপত্র • এনসাইক্লোপেডিয়া • ডিকশনারী • ইনডেক্স • সরকারি-বেসরকারি বার্ষিক প্রতিবেদন • সরকারের বিভিন্ন বিভাগের রেফারেন্স

সম্পাদকীয় পাতার পৃষ্ঠাসজ্জা ---------- ৬২
• পুরনো দিনের সম্পাদকীয় পাতা • পৃষ্ঠাসজ্জা করতে গিয়ে যে বিষয়গুলো মনে রাখতে হয় • মতামত পাতা • কয়েকটি জাতীয় পত্রিকার পৃষ্ঠাসজ্জা • ইত্তেফাক • জনকণ্ঠ • সংবাদ • ইনকিলাব • ভোরের কাগজ • প্রথম আলো • দ্য বাংলাদেশ অবজারভার • দ্য ডেইলি স্টার • দ্য ইনডিপেন্ডেন্ট

সম্পাদকীয় লেখকের দায়িত্ব ও গুণাবলী ---------- ৭১
সম্পাদকীয় লেখকের দায়িত্ব • সম্পাদকীয় লেখকের বৈশিষ্ট্য • সম্পাদকীয়কে গ্রহণযোগ্য করে তোলা

সম্পাদকীয় পাঠক ---------- ৭৪

নমুনা উপ-সম্পাদকীয় ---------- ৭৭
নিবেদন ইতি (অভাজন) • প্রকৃত ধর্মের ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে (হাবিবুর রহমান মিলন) • বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের প্রকৃত পিতা কে? (আবদুল গাফফার চৌধুরী) • What next? (Editor of Holiday) • NATO is vital for the challenges of the new century (R Nicholas Burns)

সাংবাদিকতার পরিভাষা ---------- ৯৪

তথ্য-নির্দেশ ---------- ৯৫

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সম্পাদকীয় নীতিমালা

সংবাদপত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ পাতা হলো সম্পাদকীয় পাতা। এ পাতার লেখকরা সমাজের বুদ্ধিজীবী শ্রেণী। তারা সমাজের বহুবিধ সমস্যা নিয়ে চিন্তা করার পাশাপাশি তার সমাধানও দিয়ে থাকেন। বিজ্ঞানী ও অনুসন্ধানকারী যেমন কোনো সমস্যার কারণ খুজে তার সমাধানের পথ বের করেন সম্পাদকীয় লেখকরাও তেমনভাবে তাদের লেখায় সমাজের বিদ্যমান সমস্যাসমূহের সঠিক সমাধানটি দিতে চেষ্টা করেন; দিক-নির্দেশনা দিতে পারেন। এক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে রাজনৈতিক সংস্কার, ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং বিতৃষ্ণা। কিন্তু কেবলমাত্র যুক্তির মাধ্যমেই তিনি এসকল বাধাসমূহ এড়াতে পারেন।

সম্পাদকীয় পাতাতে সাধারণত সংবাদপত্রের বেতনভুক্ত কর্মচারি বা লেখকরা লিখে থাকেন। কিন্তু সংবাদপত্রের মূল ক্ষমতার অধিকারী হলেন সম্পাদক। তিনি ঐ পত্রিকার প্রকাশকও বটে। সংবাদপত্রের পাতায় তাই সাধারণত তার মতাদর্শেরই প্রতিফলন ঘটে। কিন্তু অনেক সময় সংবাদপত্রের পাতায় জনগণের আদর্শের প্রতিফলনও প্রকাশ পায়। এক্ষেত্রে যদি ঐ সম্পাদক ও প্রকাশক জনগণের আদর্শের সাথে একাত্ম হন তবে সংবাদপত্রে জনমতের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। আবার কখনও কখনও বিজ্ঞাপনদাতার চিন্তা ও আদর্শের দ্বারাও প্রভাবিত হন সম্পাদক। এক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনদাতার আদর্শের প্রতিফলন লক্ষ করা যায় তার সংবাদপত্রে। আবার সম্পাদক বা মালিকের ব্যবসায়িক কৌশলও সংবাদপত্রের নীতিমালা নির্ধারণে যথেষ্ট প্রভাব ফেলে। যদি কোনো সংবাদপত্রে এ ধরনের বহুবিধ আদর্শের প্রতিফলন দেখা যায় তবে সম্পাদকীয় নীতিমালার ধরন নির্ধারণ করা সত্যিই কঠিন হয়ে পড়ে।

www.pathagar.com

আমেরিকার সংবাদপত্রসমূহে এধরনের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। বাংলাদেশেও কোনো কোনো সংবাদপত্রে এই নীতি লক্ষণীয়। ৭৫ থেকে ৯০ পর্যন্ত বাংলাদেশের সংবাদপত্রসমূহ সুনির্দিষ্ট কোনো নীতিতে অবস্থান নেয়নি। বিশেষ করে জেনারেল এরশাদ-এর সামরিক শাসনের সময় ইত্তেফাক-এর মতো নেতৃত্বস্থানীয় পত্রিকাও নির্দিষ্ট কোনো অবস্থান নিতে পারেনি। এ পত্রিকার সম্পাদকীয় লেখকরা এসময় এমনভাবে লিখেছেন যা সরকারের বিরুদ্ধে কোনো শক্ত অবস্থান গ্রহণ করতে পারেনি। এমনকি দৈনিক ইত্তেফাক-এ ৯০-এর নভেম্বর মাসে লেখা বিভিন্ন সম্পাদকীয়তেও সে সময়কার গণআন্দোলনের তেমন কোনো চিত্র ফুটে ওঠেনি। অবশ্য সামরিক শাসনামলে সংবাদপত্রের বিধি-নিষেধও এর পেছনে একটি অন্যতম কারণ।

এটা সত্যি যে, একজন সম্পাদক কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সম্পাদকীয় লেখার এবং সেটাকে একটি ক্রুসেডে রূপ দেয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন। যেমনটি দিয়েছিলেন জেমস্ ফ্রাঙ্কলিন ১৯৭১ সালে তার দি নিউ ইংল্যান্ড ক্যারেন্ট (Courant) নামক সংবাদপত্রে।

অনেক সময় সম্পাদক নিজেই ব্যক্তিগতভাবেই রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত হন। সেক্ষেত্রে সম্পাদকের রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতিফলন ঘটে পত্রিকাটির সম্পাদকীয় লেখনীর মাঝে। ফলে পত্রিকাটির পক্ষে বস্তুনিষ্ঠ, নিরপেক্ষ, কল্যাণমুখী সম্পাদকীয় লেখা কঠিন হয়ে পড়ে। অনেকক্ষেত্রে সম্পাদকের ব্যবসায়ী নীতি পত্রিকার সার্কুলেশন এর ওপর প্রভাব ফেলে। মালিক, সম্পাদকের অন্য কোনো ব্যবসা থাকলে সেই ব্যবসা চালানোর সহায়ক শক্তি হিসাবে সে সংবাদপত্রকে ব্যবহার করে। ফলে পত্রিকার সার্কুলেশন কমে যায়। শুধু সার্কুলেশন নয়, এর প্রভাব পড়ে পাঠকদের ওপরও। সুতরাং সংবাদপত্রের প্রধান ব্যক্তি সম্পাদক হলেও সম্পাদকীয় পাতাসহ সংবাদপত্রের সকল পাতায় সম্পাদকের মতাদর্শ ছাড়াও প্রতিফলন ঘটে জনগণের মতাদর্শ, বিজ্ঞাপনদাতার মতাদর্শ, ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতা, গোষ্ঠীস্বার্থ ইত্যাদি অনেক বিষয়। সম্পাদকীয় নীতিমালা নির্ধারণকারী এ ধরনের মতাদর্শকে সাধারণত দুটি বিষয়ে ভাগ করা যায়। (১) অভ্যন্তরীণ বিষয় (২) বাইরের বিষয়।

অভ্যন্তরীণ বিষয়

অভ্যন্তরীণ বিষয়সমূহের মধ্যে অন্যতম হলো মালিক ও সম্পাদক কর্তৃক নিয়ন্ত্রণ।

মালিকানা

সম্পাদকীয় নীতিমালা প্রথম ও নিয়ন্ত্রিত হয় সংবাদপত্রের মালিকের দ্বারা। সংবাদপত্র যেহেতু একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কাজেই এতে লোকসানের ঝুঁকি থাকবেই। এই ঝুঁকির

www.pathagar.com

কারণে সংবাদপত্রের মালিক সাধারণত সম্পাদকীয় নীতিমালা নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। কারণ সংবাদপত্রের অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িত হচ্ছে সার্কুলেশন। যদি সার্কুলেশন কমে যায় তবে সে সংবাদপত্র বেশিদিন চলতে পারবে না।

সংবাদপত্র যেখানে সম্পত্তি

সংবাদপত্র কেবলমাত্র কোনো বৃহৎ প্রতিষ্ঠান নয়, এটি বর্তমানকালের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যয়বহুল। একটি ছোট্ট উদাহরণের মাধ্যমে এটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সংবাদপত্রের মালিক সংবাদপত্রের নির্দিষ্ট জায়গা ভাড়া দিলো হয়তো কোনো নাট্যদলকে কোনো নাটক উপস্থাপনের জন্য। মালিক/সম্পাদক এটি করল যাতে করে তা একদিকে যেমন পাঠকদের বিনোদন প্রদান করে অন্যদিকে তেমনি এর ফলে কিছু নগদ অর্থ সংবাদপত্রের হাতে আসে। কিন্তু দেখা গেলো, যে নাট্যদলের নাটক প্রচার করা হচ্ছে তা পাঠকদের পছন্দ নয়। ফলে সংবাদপত্রের গুডউইল নষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এর সার্কুলেশনও স্বাভাবিকভাবেই কমে যেতে পারে।

অন্যদিকে বড় বাজেটের সংবাদপত্রে অর্থ আসতে বাধ্য। উদাহরণ হিসাবে আমাদের দেশের জনকণ্ঠের কথা বলা যায়। দৈনিক জনকণ্ঠ যাত্রা শুরু করে একটি বড় বাজেট নিয়ে। যার ফলে তারা দেশের ৫টি বিভাগীয় শহর থেকে একই সঙ্গে সংবাদপত্র বের করতে পারছে। শুধুমাত্র একারণেই অন্যান্য সংবাদপত্রগুলো জনকণ্ঠের সঙ্গে ব্যবসায় ঠিকতে পারছেনা।

এ ধরনের আর্থিক ঝুঁকি থাকার কারণে সংবাদপত্রের মালিক পক্ষ স্বাভাবিকভাবেই একটি নিরাপদ পন্থা বেছে নেয়। এই নিরাপদ পন্থা হলো Business Ethics। Business Ethics বা ব্যবসা নীতি অন্য কোনো ব্যবসা চালানোর সময় প্রয়োগ করার তেমন একটা প্রয়োজন নেই। কারণ এর সঙ্গে নৈতিকতার সম্পর্ক রয়েছে। "সততাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা এবং ক্রেতা সবসময় সঠিক" এ দুটি বিষয় মাথায় রেখে চললে সংবাদপত্রের উন্নয়ন ঘটে। Scripps-Howard সংবাদপত্র সমূহের একজন সম্পাদক-এর মতে আমরা সবসময় যথোচিত, শোভন ও বিশ্বাসযোগ্য বিজ্ঞাপন ছাপি আমাদের সংবাদপত্রে। কারণ আমাদের পাঠকরা তাই চায়। আমরা কেবলমাত্র বিশ্বাসযোগ্য ও সত্য খবর ছাপি, যার কারণে "আমরা পাঠকের বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে পেরেছি। এ কারণে আমাদের সার্কুলেশন ও সবসময় এক ধারায় চলছে।" এ ধরনের নীতিতে যতটা না নৈতিকতা রয়েছে তারচেয়ে বেশি রয়েছে বাস্তবতা এবং এটাই হলো আধুনিক সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানের মূলনীতি।

www.pathagar.com

প্রকাশক সমিতি

এটি সত্য যে প্রকাশক একদিকে যেমন একজন ব্যবসায়ী, অন্যদিকে তেমনি একজন সামাজিক মানুষ। ফলে প্রকাশক-এর সাথে অন্য মানুষের বিভিন্ন ধরনের সম্পর্ক স্বাভাবিক ভাবেই সম্পাদকীয় নীতিমালায় কিছুটা হলেও প্রভাব ফেলে। সংবাদপত্রের 'বিজ্ঞাপন' সার্কুলেশন-এর একটি বড় কারণ। এ কারণে বড় বড় সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় নীতিমালায় এই বিজ্ঞাপনদাতাগণ ব্যাপক প্রভাব রাখে। "ফ্রেঞ্চ এ্যাডভারটাইজিং সাপ্লিমেন্ট" এর সম্পাদক ও প্রকাশক মি: উইলিয়াম এ্যালেন হোয়াইট সম্পাদকীয় নীতি নির্ধারণে এ ধরনের সম্পর্ককে গুরুত্বপুর্ণ দিক হিসাবে বিবেচনা করেন। তার মতে 'আমার জানামতে কোনো সম্পাদক-ই এতটা ব্যবসায়িক নন যে সরাসরি কোনো বিজ্ঞাপনদাতার নির্দেশে সংবাদপত্র চালান। আবার কোনো সম্পাদকই এতটা উদার নন যে ব্যবসায়িক পরিবেশ তার ওপর কোনো প্রভাব ফেলবেনা। এটাই সত্য যে তিনি তার দৈনন্দিন সকল কাজে এ সকল ব্যবসায়ীদের সাথে ওঠাবসা করেন। ফলস্বরূপ তাদের চিন্তা-চেতনা, ব্যবসায়িক নীতি সব কিছু তার ওপর প্রভাব ফেলে।'

ইদানিং সংবাদপত্র জগতে মালিক-সম্পাদক হিসাবে যারা আছেন- তাদের অনেকেই ব্যবসায়ী/শিল্পপতি বা প্রাক্তন আর্মি অফিসার। এদের কেউই সংবাদপত্র জগতের নন। অন্যান্য শিল্প বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মতোই তারা সংবাদপত্রকে দেখে থাকেন। এদের মূল উদ্দেশ্য অন্যান্য ব্যবসার মতো পুঁজি খাটিয়ে লাভবান হওয়া। আমাদের দেশে দৈনিক জনকণ্ঠ, আজকের কাগজ, বাংলাবাজার পত্রিকার সম্পাদক অন্য পেশা থেকে আসা। দৈনিক জনকণ্ঠ পত্রিকার সম্পাদক জনাব আতিকুল্লাহ খান মাসুদ পুরোপুরি শিল্পপতি। জনকণ্ঠ ছাড়াও তার রয়েছে গ্লোব শিল্প। একারণে এ পত্রিকার নীতি হলো যেকোনভাবে সংবাদপত্রের সার্কুলেশন ধরে রাখা। তিনি জনকণ্ঠকে পুরোপুরি একটি সংবাদপত্র শিল্প হিসাবে দাঁড় করিয়েছেন।

অন্যদিকে বাংলাবাজার পত্রিকা এবং আজকের কাগজ পত্রিকা দুটির সম্পাদক হলেন প্রাক্তন সেনা কর্মকর্তা। এ সকল সংবাদপত্রসমূহের মালিক সম্পাদকের কেউই সাংবাদিকতার সাথে জড়িত ছিলেন না। ফলে এসকল পত্রিকার সম্পাদকীয় নীতিমালার বৈশিষ্ট্য অনেকটা নির্ধারণ করে বিজ্ঞাপনদাতা গোষ্ঠী অথবা সম্পাদকের ব্যবসায়ী দৃষ্টিভঙ্গি। সম্পাদকের যদি অন্য কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান থাকে তবে তার সহায়ক শক্তি হিসাবে অনেক সময় সংবাদপত্র বের করা হয়। এক্ষেত্রে মূল লক্ষ্য থাকে ঐ শিল্প প্রতিষ্ঠানকে লাভজনক করা। আবার অনেক সময় অন্য পেশা থেকে এসেও কেউ কেউ প্রকাশক, সম্পাদক হয়ে যান। বাংলাবাজার

www.pathagar.com

এবং আজকের কাগজের সম্পাদক উভয়েই তাদের পত্রিকায় নিয়মিত সম্পাদকীয় মতামত প্রকাশ করে থাকেন। কিন্তু তা কখনই সম্পাদকীয়ের মতো মর্যাদাপূর্ণ হয় না।

অন্যদিকে সংবাদপত্রের মালিকানার ধরন অনেকক্ষেত্রে সম্পাদকীয় নীতিমালায় প্রভাব ফেলে। অর্থাৎ মালিকানাটি একক, নাকি পরিবারিক না যৌথ মালিকানা তার ওপর ভিত্তি করে সম্পাদকীয় নীতিমালার কাঠামোয় পার্থক্য লক্ষ করা যায়। সংবাদপত্রের মালিকানায় কর্মচারীদের অংশগ্রহণের প্রবণতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ এ ধরনের মালিকানাধীন সংবাদপত্রে সম্পাদকের তেমন কোনো প্রত্যক্ষ প্রভাব থাকেনা। বরং সংবাদপত্রটি তখন সাংবাদিকদের মত প্রকাশের একটি মাধ্যম হয়ে ওঠে এবং এ ধরনের সংবাদপত্রের টিকে থাকার সম্ভাবনাও অনেক বেশি। তবে এক্ষেত্রেও সংবাদপত্রটি যে পুরোপুরি প্রভাবমুক্ত, তা বলা যায় না। বিশেষ করে এ ধরনের সংবাদপত্র যদি কোনো ব্যাংক ঋণ নিয়ে থাকে তবে ঋণকালীন সময়ে সংবাদপত্রটি ঐ ব্যাংকের বিরুদ্ধে অনেক সময় কোনো মত প্রকাশ করতে পারেনা।

সম্পাদক কর্তৃক নিয়ন্ত্রণ

সম্পাদকীয় নীতিমালার মাধ্যমে কোনো সংবাদপত্র তথা সাংবাদিকের রীতিনীতি, আদর্শ ও জ্ঞানের বহিঃপ্রকাশ ঘটে যখন সংবাদপত্রকে কোনো ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয় না। তবে সকল সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে বিষয়টি এক নয়। ছোট-ছোট সংবাদপত্র বা তার চেয়ে একটু বড় সংবাদপত্রের মালিক সরাসরি নির্দেশ দিয়ে থাকেন সম্পাদকীয় নীতিমালা মেনে চলার এবং তার প্রতি বিশ্বস্ত থাকার। কিছু-কিছু সংবাদপত্রের মালিক সম্পাদকীয় নীতিমালা খুব সামান্য পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। আবার অনেক সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে মালিকের নিয়ন্ত্রণ একদম থাকেনা। এক্ষেত্রে সম্পাদকীয় লেখকদের স্বাধীনতা থাকে। যদিও তা খুব কম ক্ষেত্রে সম্ভবপর। একজন সাংবাদিকের প্রচুর পয়সা না থাকলে তার পক্ষে কোনো ব্যক্তিগত মতামত প্রদান সম্ভব নয়। সত্তুরের দশকেও আমাদের দেশে সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠা করা খুব সহজ ব্যাপার ছিল। কিন্তু শিল্প হিসাবে প্রতিষ্ঠা পাওয়ায় সংবাদপত্রে প্রচুর অর্থের বিনিয়োগ হচ্ছে, যার ফলে সংবাদপত্রকে লাভজনক করতে না পারলে বন্ধ হয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে। উদাহরণ হিসাবে বেক্সিমকো মিডিয়া'র দৈনিক মুক্তকণ্ঠ দেয়া যায়। প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করা সত্ত্বেও সংবাদপত্রটি টিকতে পারেনি কেবলমাত্র মালিক-এর সম্পাদকীয় নীতিমালায় হস্তক্ষেপ করার ফলে। এ সকল কারণে সংবাদপত্রের একটি স্বতন্ত্রসত্তা সম্পাদকীয় কাউন্সিল-এর মাধ্যমে সম্পাদকীয় লেখকরা তাদের মতামত প্রকাশ করে থাকেন। তবে কিছু-কিছু সম্পাদকীয় লেখক এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। তাদের লেখা

www.pathagar.com

সম্পাদকীয় পড়লে বোঝা যায় লেখার ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করেন। বড় সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় লেখকরা সাধারণত এই স্বাধীনতা ভোগ করে থাকেন। এর কারণ, যে সাংবাদিক মুক্তমনা সে কখনই অতি রক্ষণশীল কোনো সংবাদপত্রে চাকুরি খুঁজবেনা। অবশ্য যদি তার এলাকায় অনেক মুক্তমনা ও স্বাধীন সংবাদপত্রের অস্তিত্ব থাকে তবেই এ মানসিকতার প্রয়োগ সম্ভব।

তাছাড়া যিনি লিখবেন, সম্পাদকীয় নীতিমালা নির্ধারণে তারও একটা বক্তব্য, একটা নিজস্ব দর্শন থাকা উচিত। যদি তার দর্শনের সাথে তার মতাদর্শের মিল না থাকে তবে তিনি তা লিখতে বাধ্য নন। কারণ বড় সংবাদপত্রসমূহে একাধিক স্টাফ থাকে যাদের মধ্যে অনেকেই সম্পাদকীয় কাউন্সিল এর নিয়ন্ত্রণে কাজ করতে পারেন। অনেক সম্পাদকীয় লেখায় কোনো মতদ্বৈততা থাকেনা। এর মূলকৃতিত্ব ঐ সম্পাদকীয় লেখকের। কারণ এই লেখকরা নিজেদেরকে স্বাধীন ও মুক্তচিন্তার ধারক বলে মনে করেন। সুতরাং সম্পাদকীয় নীতিমালা যাই হোক না কেন সম্পাদকীয় লেখক যদি মুক্তচিন্তা ও স্বাধীন ব্যক্তিত্বের অধিকারী হন তবে তার দ্বারা যেকোন সম্পাদকীয় লেখা সম্ভব।

বাইরের কারণসমূহ

স্যার মারটিন কনওয়ে জননেতা (crowd-leader)-দের শ্রেণী করণ করেছেন যা বিভিন্ন সংবাদপত্রে মেনে চলা হয়। তিনি এই শ্রেণীকরণে জননেতাদের crowd-compeller এবং crowd-exponent হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। তার মতে crowd-compeller হলো তারাই যারা একটি সুদূর লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য ইতোমধ্যে একটি বড় পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন। এ লক্ষ্যে তারা জনগণকে পরিচালনা করে থাকেন যাতে তারা তাদের কাজ সুষ্ঠভাবে করতে পারে। নেপোলিয়ান বোনাপোর্ট, জোসেফ চেম্বারলিন হলেন এ ধরনের নেতা। অন্যদিকে crowd-exponent হলেন সে ধরনের নেতা যিনি জনগণকে দেখেন সহানুভূতির দৃষ্টিতে। তাদের অনুভূতিকে বোঝেন এবং তাদের পক্ষে কথা বলেন। প্রকৃতপক্ষে তার শক্তির মূল উৎস জনগণ এবং তিনি জনগণকে তার বক্তব্য এবং কাজের মাধ্যমে আবার তা ফিরিয়ে দেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং নেলসন ম্যান্ডেলা এ ধরনের অবিসংবাদিত নেতা। আধুনিক সমাজে খুব কম রাজনীতিবিদ এ ধরনের জননন্দিত নেতা।

সাধারণত আমেরিকান সংবাদপত্রে এ ধরনের জননন্দিত নেতার বক্তব্য একটি আবশ্যকীয় বিষয়। বলা হয়ে থাকে যে, সংবাদপত্র হলো জনগণের বক্তব্যের প্রতিচ্ছবি। কিছু

www.pathagar.com

সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে এ বক্তব্য সঠিক। কারণ এ ধরনের সংবাদপত্রে জনগণের কর্তৃত্ব গঠনের চেষ্টা করা হয়। এ ধরনের সংবাদপত্রসমূহ তাদের সংবাদ অথবা প্রবন্ধের মাধ্যমে জনগণকে আনন্দ প্রদান করে থাকে। তাদের সম্পাদকীয়তে কেবলমাত্র জনগণের চিন্তার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। এতে জনগণ সংক্রান্ত কোনো অপরিহার্য বিষয়ে প্রথাগত নীতির প্রতিফলন ঘটে। এক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে জনগণ যা চায় তা প্রতিফলিত হয় এ ধরনের সংবাদপত্রে। এ জাতীয় সংবাদপত্রে কোনো ইস্যুতে ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো মতাদর্শ প্রতিফলিত হয় না যতক্ষণ না অন্য কোনো সংবাদপত্র ঐ ইস্যু নিয়ে কোনো মতামত ব্যক্ত না করে। তবে যখন কোনো ইস্যুতে তারা কোনো নির্দিষ্ট অবস্থান নেয় তখন বলিষ্টভাবেই তার সমর্থনে মতামত ব্যক্ত করে। ১৯৯০ এর গণআন্দোলনের সময় প্রকাশিত দৈনিক ইত্তেফাকের সম্পাদকীয়সমূহ দেখলে এই বক্তব্যের সত্যতা পাওয়া যায়। ১৯৯০ এর ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত ইত্তেফাক-এর সম্পাদকীয়তে গণআন্দোলনের কোনো ছাপ লক্ষ করা যায়নি। কিন্তু ৬ ডিসেম্বর ৯০-এর এরশাদ সরকারের পতনের পর থেকে প্রায় সকল সম্পাদকীয়তে গণআন্দোলনের কথা এসেছে। খুব কম সংখ্যক সংবাদপত্র আছে যারা খুব দ্রুত কোনো বিষয়ে বা কোনো ইস্যুতে নীতিগত পরিবর্তন আনতে পারে বা কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসতে পারে। সাধারণ সার্কুলেশনের সংবাদপত্রসমূহ সাধারণত সমাজে বিদ্যমান প্রচলিত রীতিনীতি ও মূল্যবোধ এবং সামাজিক ঐতিহ্য মেলে চলতে বাধ্য হয়। যেকোন সংবাদপত্রেরই জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্যতা থাকতে হবে, না হলে সে সংবাদপত্র কোনো সংবাদপত্রই নয়।

দলীয় অবস্থান

কোনো কোনো ক্ষেত্রে পাঠকদের দলীয় অবস্থানের কারণে সংবাদপত্র খুব সামান্য পরিমাণে লেখার স্বাধীনতা ভোগ করে। অনেক সংবাদপত্রই এ ধরনের নিয়ন্ত্রণ থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত। কিন্তু বড় এবং প্রাচীন সংবাদপত্রগুলো (যা ছিল একসময় কোনো দলের সঙ্গে একীভূত) পাঠকদের নির্বাচকমণ্ডলীতে পরিণত হওয়ায় এ ধরনের পরিস্থিতিতে পড়তে হয়। এ জাতীয় ঘটনা ঐ সংবাদপত্রকে একটি ইনস্টিটিউটটে পরিণত করে।

যেসব শর্ত একজন রাজনীতিবিদের স্বাধীনতাকে সীমাবদ্ধ করে সেসব শর্ত আবার একজন সম্পাদকের স্বাধীনতাকেও সীমাবদ্ধ করে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই নিয়ন্ত্রণ রাজনীতিবিদদের চাইতেও বেশি হয়। রাজনীতি হলো একটি সমষ্টিগত ও দলীয় বিষয়। এজন্য একজন রাজনীতিবিদকে অবশ্যই দলের ভালো দিক দেখতে হবে এবং দলীয় প্রার্থীকে অবশ্যই সমর্থন দিতে হবে। কোনো দলের মুখপাত্র হিসেবে সংবাদপত্রকেও দলের মনোনিত প্রার্থীকে সমর্থন দিতে হয়। নাহলে ঐ সংবাদপত্রের সার্কুলেশন কমে

www.pathagar.com

যেতে পারে। উদাহরণ হিসাবে New York Sun পত্রিকার কথা বলা যায়। ১৮৮৪ সালে দলীয় মনোনিত প্রার্থী ক্লিভল্যান্ড (cleveland)- কে সমর্থন না করে পত্রিকাটি স্বতন্ত্র প্রার্থী বেন বাটলার (Ben-Butler)-কে সমর্থন দেয়। ফলে New York Sun ঐ সময়ে তার প্রচুর পাঠক হারিয়েছিল যা তার পত্রিকার সার্কুলেশনকে অনেক নামিয়ে আনে।

তবে বর্তমানকালের সংবাদপত্রগুলো দলীয় মুখপত্রের তুলনায় অনেক বেশি স্বাধীন। কিন্তু তারপরও দলীয় অবস্থান সম্পাদকীয় নীতিমালা নির্ধারণে এখন পর্যন্ত যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

গোষ্ঠীস্বার্থ

সম্পাদকীয় নীতিমালা নির্ধারণে আরেকটি গুরুত্বপূর্ন ও তাৎপর্যপূর্ন নির্ধারক হলো গোষ্ঠী স্বার্থ বড় করে দেখা। গোষ্ঠীস্বার্থের কারণে সম্পাদকীয় মতামতের প্রকাশ অনেক সময় জনগণ বাধাগ্রস্ত হয়। যদি কোনো অঞ্চলের, দেশের অর্থনীতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে তবে ঐ অঞ্চলের সংবাদপত্রসমূহের সম্পাদকীয় নীতিমালা হবে। ঐ অঞ্চলের জনগণও অর্থনীতির ওপর গুরুত্ব দেবে। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে সংবাদপত্রের এই গোষ্ঠী স্বার্থ বোধ অনেক সময় অঞ্চলের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অর্থনৈতিক বিষয় নয় কিন্তু কোনো ক্ষুদ্র গোষ্ঠী স্বার্থের ক্ষেত্রে সংবাদপত্রের অবস্থান এ ধরনের ক্ষতির কারণ হতে পারে।

পাঠকের আদর্শ

গোষ্ঠী স্বার্থ এবং দলীয় অবস্থান মিলে কোনো ব্যক্তির আদর্শের প্রকাশ ঘটে। এর এই আদর্শ সম্পাদকীয় নীতিমালার স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। আমেরিকার জনগণের অধিকাংশের মধ্যে যে আদর্শগত মিল রয়েছে তা হলো তারা দল এবং গোষ্ঠী সম্পর্কে যথেষ্ট সজাগ এই আদর্শ কী এবং তা কিভাবে নৈতিকতা, সামাজিক বিচার, দেশপ্রেম, আইন এবং প্রথাগত জীবন এর সাথে জড়িত সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় তা ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। তবে যেসব সম্পাদক এ ধরনের আদর্শ সম্পর্কে সজাগ নন তারা তাদের নীতি প্রচারে বাঁধার সম্মুখিন হয়ে থাকেন। তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে যেমন দেশ যদি যুদ্ধে লিপ্ত হয় তখন এ ধরনের নৈতিকতাহীন আদর্শের প্রচার সম্ভব।

প্রতিযোগিতা

সংবাদপত্র বর্তমানে একটি শিল্প। অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠানের মতো সংবাদপত্রেও রয়েছে প্রতিযোগিতা। বিভিন্ন সংবাদপত্রের মধ্যে বিদ্যমান এই প্রতিযোগিতাও নীতিমালার ওপর

www.pathagar.com

অনেকখানি প্রভাব ফেলে। এ জন্য অনেক সম্পাদকই তার প্রতিযোগী সংবাদপত্রের নীতিমালা প্রায়ই পর্যবেক্ষণ করে থাকেন। দেখা যায়, এ কারণে অনেক সংবাদপত্রই তার প্রতিযোগী সংবাদপত্রের সাথে টেক্কা দিতে গিয়ে অনেক সময় মিথ্যার আশ্রয় নেয়। এর পেছনে দুটি উদ্দেশ্য কাজ করে। প্রথমত প্রতিযোগী সংবাদপত্র যেন কোনো কাজের জন্য প্রশংসিত না হয় তার ব্যবস্থা করা। এ উদ্দেশে ঐ সংবাদপত্র যে শুধু সরাসরি ঐ কাজের বিরোধীতা করে তা নয়। বরং একই সাথে ঐ বিষয়ে সংবাদপত্রে কোনো কিছু ছাপায় না বা ঐ কার্যক্রমের প্রবল নিন্দা করে।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটি অনেক লোকের (অপেশাদার লোক) কাছেই স্পষ্ট হবেনা। এটি সত্য যে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা সংবাদপত্রটি খুব স্বাভাবিকভাবেই লাভবান হবে এবং অন্যদের প্রভাবিত করতে পারবে। বর্তমানকালে পাঠকরাও মতামত প্রদান করে থাকে। কোনো কোনো সংবাদপত্র তাই এ ধরনের পাঠকদেরকে একটি সুনির্দিষ্ট পাঠক নির্বাচকমণ্ডলীর প্রতিনিধি হিসাবে দাঁড় করানোর চেষ্টা চালায়। এর দ্বারা ঐ সংবাদপত্রটি কোনো সুনির্দিষ্ট বিষয়ে তার প্রতিযোগী সংবাদপত্রকে টেক্কা দিতে চেষ্টা করে। পাঠকদেরকে সম্পাদকীয় নীতিতে অন্তর্ভুক্ত করানোর মাধ্যমে ঐ সংবাদপত্রটি মূলত তার সার্কুলেশন বজায় রাখার বা বৃদ্ধি করার চেষ্টা চালায়।

অর্থনৈতিক চাপ এবং ভর্তুকী

সরকার বা কোনো বৃহৎ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান অনেক সময় কোনো ক্ষুদ্র বা রুগ্ন সংবাদপত্র চালানোর জন্য অর্থ সাহায্য বা ভর্তূকী প্রদান করে। ভর্তূকী প্রদানের সাথে সাথে সরকার বা ঐ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কিছুটা হলেও ঐ সংবাদপত্রকে নিয়ন্ত্রণ করে। সাধারনত নির্দেশ থাকে যে কোনো মেট্রোপলিটান শহরের সংবাদপত্র যেন কোনভাবেই তাদের জন্য বরাদ্দকৃত ভর্তূকীর বাইরে না যায়। এ ধরনের প্রচেষ্টা কোনো পত্রিকাকে আরো বেশি ভর্তূকী নির্ভর করে তোলে। ফলে ভর্তূকী নির্ভরতার কারণে ঐ সংবাদপত্রে কার্যত ঐ ব্যবসায়ী বা সরকারের নিয়ন্ত্রণ বহাল থাকে। অনেক ব্যবসায়ী জনগণকে বোকা ও বোধবুদ্ধিহীন বলে মনে করেন এবং তাদের এই মনোভাবের কারণে তারা বিশ্বাস করেন যে, জনগণ খুব সহজেই এ ধরনের ভর্তূকী সম্পন্ন সংবাদপত্রের মাধ্যমেও উদ্বুদ্ধ হবে।

সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনদাতাদের মধ্যে যদি এই আকাঙ্খা থেকে থাকে তবে তারা স্বাভাবিকভাবেই দেশের সাপ্তাহিকীগুলো বা ছোট সংবাদপত্রগুলোকে তাদের আকাঙ্খা বাস্তবায়নের জন্য চাপ প্রয়োগ করবে। ছোট ছোট সংবাদপত্রের প্রকাশকরা সমাজে তাদের পত্রিকাকে একটি ভালো অবস্থানে দাঁড় করাতে পারেন না। কারন এ ধরনের প্রকাশকের

www.pathagar.com

শিক্ষার অভাব রয়েছে। অভাব রয়েছে কর্মীদের মধ্যে উদ্দীপনা সৃষ্টির। তিনি উপলব্ধি করেন না যে, তিনি তার নিজের প্রজ্ঞা, মেধা ও বুদ্ধিমত্তা দ্বারা, বিজ্ঞাপনদাতার চাপকে খুব সহজেই এড়াতে পারেন। কারণ বিজ্ঞাপনদাতার এ ধরনের অযৌক্তিক দাবীকে মেনে নেবার কোনো প্রয়োজন প্রকাশকের নেই।

সংবাদপত্রের ওপর এ ধরনের অর্থনৈতিক চাপ আগেও ছিল এখনও আছে। আমরা সবসময় শুনে আসছি যে, সংবাদপত্রগুলো অনেক সময় ব্যাংক ঋণ গ্রহণ করে থাকে। ঋণ গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে এ ধরনের সংবাদপত্রগুলো ঐ ব্যাংকের নীতিমালাও গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু প্রকাশক যদি শক্ত মনের মানুষ হন এবং তার যদি নিজস্ব আদর্শ ও নীতি থেকে থাকে তবে ব্যাংক ঋণ গ্রহণ করলেও ঐ সংবাদপত্রের উপর কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারবেনা ঋনদাতা ব্যাংক।

সম্পাদকীয় কাউন্সিল

বলা হয়ে থাকে যে, সংবাদপত্রে যে মতামত প্রকাশিত হয় তা মূলত সম্পাদকের, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সম্পাদকীয় নীতিমালা বা সম্পাদকীয় মতামত নির্ধারিত হয় ঐ সংবাদপত্রের সম্পাদকমণ্ডলীর সম্মিলিত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে। সম্পাদকমণ্ডলী এই সিদ্ধান্ত নেন একটি কাউন্সিলের মাধ্যমে যা সম্পাদকীয় কাউন্সিল নামে পরিচিত।

সম্পাদকীয় নীতিমালা মূলত অনেক মানুষের মিলিত চিন্তার ফসল। তবে এর মাধ্যমে অনেক সময় কোনো স্বতন্ত্র সত্তারও বিকাশ ঘটে। এ ব্যাপারে শিকাগো ট্রিবিউন এর বক্তব্য হলো "কোনো দায়িত্বশীল সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় লেখনী কোনো এক ব্যক্তি কর্তৃক সৃষ্ট হলেও ঐ সম্পাদকীয় লেখনীতে প্রকাশিত সম্পাদকীয় মতামত কোনো একক ব্যক্তির নয়। বরং তা হলো সম্পাদকীয় কাউন্সিল এর সম্পাদকমণ্ডলীর সম্মিলিত মতামত।"

সম্পাদকীয় কাউন্সিল সংবাদপত্রের একটি বিশেষ শ্রেণীর লেখকের সমন্বয়ে গঠিত, যাদের মুল দায়িত্ব হলো সম্পাদকীয় লেখনীর মাধ্যমে সংবাদপত্রের নীতিমালার প্রকাশ করা। সম্পাদকীয় কাউন্সিল কোনো দিনের সম্পাদকীয় লেখনী হিসাবে কী লেখা হবে, কে তা লিখবে তা নির্ধারন করে থাকে। সম্পাদকীয় কাউন্সিলের এই দায়িত্ব কখনও কখনও কেবলমাত্র সম্পাদকীয় লেখকরা সম্পন্ন করলেও অধিকাংশ সময় মুখ্য সম্পাদক, ব্যবস্থাপনা সম্পাদক, রাজনৈতিক কার্টুনিস্ট, প্রকাশক এবং সম্পাদকীয় লেখকরা সম্মিলিতভাবে এই দায়িত্ব পালন করেন।

বিভিন্ন সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় কাউন্সিলের কাজ বিভিন্ন রকম। কোনো কোনো সংবাদপত্রে

www.pathagar.com

সম্পাদকীয় কাউন্সিল সম্পাদকীয় নীতিমালার সঙ্গে সঙ্গে ঐ দিনে কোনো কোনো সংবাদ প্রকাশিত হবে তাও নির্ধারণ করে থাকে। অনেক সংবাদপত্রে অবশ্য কেবলমাত্র সম্পাদকীয় পাতায় কী প্রকাশ পাবে তার সিদ্ধান্ত নেয় সম্পাদকীয় কাউন্সিল। আবার কোনো কোনো সংবাদপত্রে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়ে সংবাদপত্রের নীতি বহাল রয়েছে কি না শুধুমাত্র তাই পর্যবেক্ষণ করে সম্পাদকীয় কাউন্সিল।

সম্পাদকীয় কাউন্সিলের দায়িত্ব যাই হোকনা কেন বেশিরভাগ সংবাদপত্রের কাউন্সিল সভা হয় বেশ সাদামাটা। তবে তা নির্ভর করে প্রকাশক ও মালিক সম্পাদকীয় কাউন্সিল বা সংবাদপত্রকে কতটা নিয়ন্ত্রণ করেন তার ওপর। কাউন্সিল সভা প্রতিদিন দিনের শুরুতে ডাকা হয়। কাউন্সিল সভায় সম্পাদকীয় লেখকদের বিশেষ বিশেষ বিষয়ের ওপর লেখার নির্দেশ দেয়া হয়। যদি কোনো লেখক নির্দিষ্ট বিষয়ের সাথে একমত না হন তবে তাকে ঐ বিষয় থেকে বাদ দিয়ে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে লেখার নির্দেশ দেয়া হয়। লেখার ক্ষেত্রে সম্পাদকীয় লেখক সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করেন। তিনি তার নিজস্ব ঢং-এ নিজস্ব পদ্ধতিতে সম্পাদকীয় লিখতে পারেন। তবে লেখাতে অবশ্যই সম্পাদকীয় কাউন্সিলের মতাদর্শের প্রতিফলন থাকতে হবে। নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর লেখা সম্পন্ন হলে সম্পাদকীয় লেখক তা মূখ্য সম্পাদক বা সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতির কাছে জমা দেন। মূখ্য সম্পাদকের দায়িত্ব হলো ঐ লেখায় সম্পাদকীয় নীতিমালার যথাযথ প্রকাশ ঘটেছে কি না তা দেখা। প্রয়োজনে তিনি লেখা সম্পাদনা করে ঐ লেখায় সম্পাদকীয় কাউন্সিলের মতামতের প্রতিফলন ঘটান।

www.pathagar.com

সম্পাদকীয় পাতার বিষয়বস্তু

সম্পাদকীয়

সম্পাদকীয় মূলত সংবাদপত্রের মতামত সম্বলিত কোনো রচনা যাতে ঐ পত্রিকার নীতি ও আদর্শের প্রতিফলন ঘটে। একটি পত্রিকার সম্পাদকীয় পড়লে সে পত্রিকাটি কোনো বিশেষ গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করছে কি না তা বোঝা যায়। সম্পাদকীয় রচনা করা হয় সাধারণত কোনো চাঞ্চল্যকর ঘটনা পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার পর। অবশ্য অনেক সময় প্রকাশিত কোনো ক্ষুদ্র সংবাদ এর ওপর ভিত্তি করে সম্পাদকীয় লেখা হতে পারে যদি ঐ সংবাদের সমাজ ও গোষ্ঠীর ওপর কোনো প্রভাব ফেলার সম্ভাবনা থাকে। আবার কখনও কখনও পাঠকের চিঠি থেকেও কোনো গুরুত্বপূর্ণ সম্পাদকীয় লেখা হতে পারে।

কোনো সম্পাদকীয়তে যে শুধু মতামত প্রকাশ করা হয়, তা নয়, ঐ মতামতের স্বপক্ষে ব্যাখ্যা ও দিকনির্দেশনাও দিয়ে থাকে সংবাদপত্র। সম্পাদকীয় সম্পর্কে তাই বিভিন্ন মনীষীর ব্যাখ্যা বিভিন্ন রকম। গোল্ডেন এইজ নামক সম্পাদকীয় লিখে বিখ্যাত হয়েছিলেন এমপোরিয়া গেজেট-এর সম্পাদক ও প্রকাশক উইলিয়াম এ্যালেন হোয়াইট। সম্পাদকীয় বলতে তিনি বুঝিয়েছেন, সাধারণভাবে বললে সম্পাদকীয় হলো কিছু ঘটনার সমন্বয়ে গঠিত মতামতের প্রকাশ যা কোনো সত্যকে উপস্থাপন করে।

দি এডিটরিয়াল গ্রন্থের গ্রন্থকার লিওন ফ্লিন্ট বলেন, সম্পাদকীয় হলো কোনো সম্পাদকের প্রকাশিত মতামত যার মাধ্যমে সে তার সহজাত বুদ্ধিকে বিকশিত করতে পারে।

www.pathagar.com

আরেক মনীষী জিম এ্যালেহার্ট তার বই ভিউ অন দ্য নিউজ- এ বলেছেন, আধুনিক সম্পাদকীয় হলো কোনো গুরুত্বপূর্ণ সংবাদের তথ্য ও মতামত সম্বলিত যুক্তিসংগত ও সংক্ষিপ্ত উপস্থাপন যাতে করে তার গুরুত্ব সাধারণ পাঠকের কাছে পরিস্কার হয়। তিনি বলেছেন কোনো ঘটনার এ ধরনের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যাদানের মাধ্যমে ঐ ঘটনার ব্যাপারে কোনো পত্রিকার নীতিগত সিদ্ধান্ত কি তা ফুটে ওঠে।

প্রকৃতপক্ষে সম্পাদকীয় হলো তাই, কোনো ঘটনা ঘটল এবং তা নিয়ে কোনো তথ্য প্রকাশিত হলে তা হলো সংবাদ। এ বিষয়ে কোনো সম্পাদকীয় প্রকাশ করা হলে তাতে যে নীতির প্রতিফলন ঘটবে তা হবে সম্পাদকের নীতি।

সম্পাদকীয় গুরুত্ব

সম্পাদকীয়-এর কাজ হলো পাঠককে কোনো গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ ভালো করে বুঝিয়ে দেয়া। পাঠক পত্রিকার পাতায় কোনো চাঞ্চল্যকর সংবাদ পড়লে স্বাভাবিকভাবেই তার মনে কিছু প্রশ্নের উদয় হয়। অনেক সময় এ সকল প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয় না সাদামাটা সংবাদে। অবশ্য ফিচারে অনেক সময় এসকল প্রশ্নের উত্তর পেয়ে থাকেন একজন পাঠক। কিন্তু ফিচার সাধারনত তাৎক্ষণিকভাবে লেখা হয় না। কিন্তু সম্পাদকীয় লেখা হয় তাৎক্ষণিকভাবে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুকে কেন্দ্র করে। তাৎক্ষণিকভাবে লেখা সাদামাটা সংবাদে অনেক তথ্যই থাকেনা। তাছাড়া পাঠক অনেক সময় অনেক শব্দের অর্থও বুঝতে পারেন না। এক্ষেত্রে সম্পাদকীয় লেখক তার লেখায় ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের দ্বারা এ সকল তথ্য শব্দের অর্থ পাঠককে বুঝিয়ে দেন। তিনি খুব সুচিন্তিতভাবে ধাপে ধাপে তার লেখার সাহায্যে পাঠককে পরিস্থিতির ব্যাখ্যা দেন, কোনো খবরের গুরুত্ব সম্পর্কে উপলব্ধি করান। এই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের কাজটি তিনি করেন বিভিন্নভাবে।

প্রথমত : তিনি ঘটনার স্থান ও অবস্থানের সঠিক বর্ণনা দেন। এজন্য তিনি বিভিন্ন উপাত্ত (data) ব্যবহার করতে পারেন। অন্য কোনো জায়গায় পরপর ঘটে যাওয়া আরও কিছু ঘটনার উল্লেখ করতে পারেন। উদাহরণ হিসাবে বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া মহামারী আকারে ক্ষুরা রোগের প্রাদুর্ভাবের ঘটনার কথা উল্লেখ করা যায়। সংবাদটি পড়ার পর কোনো পাঠক এটাকে সাধারণ ঘটনা হিসাবেই ধরে নেয়, যদিনা সে জানে অন্যান্য দেশেও এই রোগ মহামারী আকারে ধারণ করেছে।

কোনো দায়িত্বশীল সম্পাদকীয় লেখক এই সংবাদ থেকে গুরুত্বপুর্ণ একটি সম্পাদকীয় লিখতে পারেন। তিনি তার লেখায় পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গার ক্ষুরা রোগের প্রাদুর্ভাবের বর্ণনা দিতে পারেন এবং একই সাথে এর ফলে গবাদী পশু কী হারে মারা যাচ্ছে এবং

www.pathagar.com

ভবিষ্যতে দেশ কী ধরনের ক্ষতির সম্মুখিন হতে পারে তার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করলে পাঠকরা রোগটির ভয়াবহতা সম্পর্কে অবগত হবেন।

দ্বিতীয়ত : ক্ষুরারোগ এর আগে কখনও হয়েছিল কী না সে ইতিহাস দিলে পাঠকদের কাছে বিষয়ের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাবে। এর মাধ্যমে পাঠকরা বুঝতে পারবে মূল সমস্যা কোথায়।

তৃতীয়ত : সম্পাদক তার লেখায় ক্ষুরা রোগের পেছনে কি কারণ রয়েছে, কেন তা মহামারী আকার ধারণ করছে সে বিষয়টি চিহ্নিত করবেন।

চতুর্থত : সম্পাদকীয় লেখকের দায়িত্ব বিষয়টির সমাধান দেয়া। অর্থাৎ ক্ষুরা রোগের পেছনে যে কারণ বিদ্যমান রয়েছে তার সমাধানের জন্য দিক-নির্দেশনা দেয়া লেখকদের দায়িত্ব।

এ উদ্দেশ্যে লেখক তার লেখনীর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে বিষয়টি সমাধানের জন্য তুলে ধরেন। কোনো সম্পাদকীয়তে এ সকল ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ উপস্থিত থাকলে কোনো সম্পাদকীয় গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। তবে ব্যাখ্যাদানের সময় সম্পাদকীয় লেখককে অবশ্যই জাতীয় নীতিমালা ও স্বার্থ যাতে বিঘ্নিত না হয় তার প্রতি লক্ষ রাখা উচিত। একই সাথে লেখাটি যেন একপেশে হয়ে না পড়ে অর্থাৎ লেখাটি যাতে সত্যনিষ্ট হয় তার প্রতিও লক্ষ রাখতে হবে।

সম্পাদকীয়-এর ধরন

সম্পাদকীয় পাতায় সাধারণত কোনো পত্রিকার নীতিমালা ও আদর্শের প্রতিফলন দেখা যায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাই এ পাতায় ব্যক্তির নিজস্ব অভিব্যক্তি প্রকাশের কোনো সুযোগ নেই। এখন পর্যন্ত সম্পাদকীয় লেখকরা তাদের লেখার বিষয়বস্তু বেছে নেবার ব্যাপারে স্বাধীন। লেখকরা সাধারণত এমন কিছু বিষয় নির্বাচন করে থাকেন যা তাদের ব্যক্তিগত অভিমত প্রকাশের সাথে সাথে পাঠককে আনন্দ দেয়, উদ্বুদ্ধ করে ও তাকে শেখায়। তবে এতে অবশ্যই পত্রিকার নীতিমালা ও আদর্শ প্রতিফলিত হবে।

প্রকৃতপক্ষে সম্পাদকীয় কলাম-এর বিভিন্ন ধরন পাঠককে অনুপ্রাণিত করে, তাকে জ্ঞানী হতে উদ্বুদ্ধ করে এবং কোনো একটি নির্দিষ্ট নীতিতে চলার জন্য তাকে উৎসাহিত করে।

লীডার ও লীডারেট

যেকোন সংবাদপত্রে সাধারণত দুটি সম্পাদকীয় থাকে। প্রথম সম্পাদকীয়কে বলে লীডার এবং দ্বিতীয়টিকে বলা হয় লীডারেট। লীডার লেখা হয় পূর্ব দিনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও চাঞ্চল্যকর সংবাদকে ভিত্তি করে। অন্যদিকে দ্বিতীয় সম্পাদকীয় বা লীডারেট লেখা হয়

www.pathagar.com

কম গুরুত্বপূর্ণ কোনো সংবাদকে কেন্দ্র করে অথবা অন্য কোনো দেশের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ-এর ওপর ভিত্তি করে। এছাড়া কাজ ও তথ্যের ভিত্তিতে সম্পাদকীয় কলাম বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত।

বিনোদনমুলক সম্পাদকীয়

সাংবাদিকতা ও সংবাদপত্রের জন্মলগ্ন থেকেই সংবাদপত্রের একটি কাজ হলো পাঠককে বিনোদন প্রদান। সংবাদ-এর সাথে সাথে তাই সম্পাদকীয় কলামেও এই বিনোদন প্রদান করে সংবাদপত্র। অনেক দৈনিক সংবাদপত্র আছে যাতে প্রতিদিনই প্রায় গুরুগম্ভীর সম্পাদকীয়-এর সাথে একটি হালকা মেজাজের সম্পাদকীয় থাকে, যার প্রধান কাজ পাঠককে বিনোদন দেয়া। এ ধরনের সম্পাদকীয় সাধারণত তৃতীয় লীডার বা দ্বিতীয় লীডারেট এ ছাপানো হয়। এ জাতীয় সম্পাদকীয়তে কোনো চলতি বিষয়বস্তু নাও থাকতে পারে। মোটামুটি কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে হাল্কা মেজাজে কিছুটা বিনোদনমূলকভাবে উপস্থাপন করাই বিনোদমূলক সম্পাদকীয় এর প্রধান কাজ।

বিনোদনমূলক সম্পাদকীয় লেখা হয় লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে; তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অনেকটা গল্প করার ঢংএ। তবে এতে কোনো উপদেশ, নির্দেশ থাকে না। আমাদের দেশের সংবাদপত্রগুলোতে ইদানিং এ ধরনের সম্পাদকীয় লক্ষ করা যায়। ভোরের কাগজের "অনাবিল জলছবি" এধরনের একটি সম্পাদকীয় কলাম যাতে খুব হালকা মেজাজে অনেকটা গল্প করার ঢংএ লেখক তার অভিজ্ঞতার বর্ণনা করেন যাতে সমাজের অনেক সত্য বিষয় ফুটে ওঠে।

উদ্বুদ্ধমূলক সম্পাদকীয়

কিছু সম্পাদকীয় আছে যা মূলত পাঠকদের উদ্বুদ্ধ করানোর জন্য লেখা হয়। এধরনের সম্পাদকীয় শিক্ষামূলক হয়ে থাকে। লেখকের নিজস্ব ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, কোনো বিশেষ বিষয়ের প্রতি লেখকের পর্যবেক্ষণ, সময় অথবা কোনো সংবাদ হতে লেখক এধরনের লেখার সূত্র পেয়ে থাকেন। এধরনের সম্পাদকীয়তে কখনো কখনো লেখক সরাসরি ও প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপন করেন পাঠকের সাথে। কিন্তু অনেকসময় লেখকের বক্তব্য হয় বস্তুনিষ্ঠ এবং পরোক্ষ। শিক্ষাদানের সাথে সাথে এ জাতীয় সম্পাদকীয় কোনো বিশেষ বিষয়ের প্রতি পাঠকদের উদ্বুদ্ধ করে তোলে।

সময় বা কালনির্ভর সম্পাদকীয়

কিছু কিছু সম্পাদকীয় রয়েছে যা বিশেষ সময়ে লেখা হয়। কোনো বিখ্যাত ব্যক্তির মৃত্যুতে অথবা মৃত্যুর দিন অথবা কোনো বিশেষ দিবস, অথবা কোনো স্মৃতিসৌধ উদ্বোধন উপলক্ষে

www.pathagar.com

এধরনের সম্পাদকীয় লেখা হতে পারে। তবে এ ধরনের সম্পাদকীয় লেখা যথেষ্ট কঠিন। কারণ প্রতিবছর কোনো একটি দিবস উপলক্ষে কিছু উপদেশ দেওয়া, নতুন কিছু বলা বেশ কঠিন কাজ। একারণে অনেক সম্পাদকীয় লেখক আছেন যারা কোনো একজনকে নিয়ে লেখা একই সম্পাদকীয় পরবর্তী বছরেও চালিয়ে দেন। তবে এক্ষেত্রে পুন:র্মুদ্রণ কথাটি উল্লেখ থাকে। যখন এই পদ্ধতি গ্রহণ করা সম্ভব না হয় তখন লেখকদের চিন্তা করা উচিত লেখাকে বা লেখার বিষয়কে কিভাবে নতুনভাবে পরিচ্ছন্ন করা যায়।

মৃত্যু নিয়ে সম্পাদকীয় লেখা যথেষ্ট কঠিন। যদি লেখক তার চাকুরি জীবনের সমস্ত সময়টুকু মৃত্যু বিষয়ে গবেষণা করে থাকেন তবে তার পক্ষে একটি ভালো সম্পাদকীয় রচনা সম্ভব। অনেক সময় উদ্ধার অভিযান বা কোনো বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলাফল যা খুবই আকর্ষণীয় ও কালোত্তীর্ণ তাও হতে পারে সম্পাদকীয় লেখার বিষয়বস্তু।

এসকল বিষয় ছাড়া আরো অনেক বিষয় আছে যা সম্পাদকীয় লেখক বেছে নিতে পারেন তার লেখার বিষয়বস্তু হিসেবে। তবে সবক্ষেত্রেই লেখক সমাজ, রাজনৈতিক পরিস্থিতি সর্বোপরি সংবাদপত্রের নীতিমালার কথা মাথায় রেখেই তার সম্পাদকীয় রচনা করবেন। যদি সংবাদপত্রের নীতিমালা হয় গণতান্ত্রিক তবে লেখককে অবশ্যই গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে লিখতে হবে। তিনি কিছুতেই সমাজতন্ত্রকে গণতন্ত্রের ওপরে স্থান দেবেন না। যদি সংবাদপত্রের মূলনীতি হয় সরকারের সমালোচনা তাহলে সম্পাদকীয়-এর ধরনও হবে সমালোচনামূলক।

চিঠিপত্র

সম্পাদকীয় পাতার সবচেয়ে মুক্ত বিষয় হলো চিঠিপত্র। চিঠিপত্র কলামে যে কেউ সে যে মনোভাবেরই হোন না কেন তার মতামত প্রকাশ করতে পারে, সম্পাদক বরাবর কোনো চিঠির মাধ্যমে। এসকল চিঠি সংবাদপত্র তথা সম্পাদকীয় পাতার প্রাণ। লুইসভিলে কুরিয়ার জার্নাল (Louisville Courier-Journal)-এর "স্যার ব্যারী বিংহাম"-এর মতে কোনো সম্পাদকীয় পাতাকে প্রাণবন্ত করে তোলে চিঠিপত্র কলাম। সম্পাদক বরাবরে লেখা এসকল চিঠিতে লেখক তার ব্যক্তিগত কষ্টকর জীবনের কথা, তার ব্যক্তিগত সমস্যার কথা, তার আশেপাশে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার চিত্র তুলে ধরেন।

সংবাদপত্র কেন চিঠি প্রকাশ করে

সংবাদপত্রের সম্পাদক অথবা সম্পাদকীয় পাতার সাথে জড়িত কাউন্সিল এসকল চিঠি ছাপায় একটি কারণে। তাহলো এসকল চিঠির মাধ্যমে পাঠক ঐ সংবাদপত্র সম্পর্কে, তার নীতিমালা সম্পর্কে ভালোভাবে জানতে পারে। সংবাদপত্রের চিঠিপত্র কলাম একজন

www.pathagar.com

পাঠককে নাগরিক হিসেবে তার বক্তব্য প্রকাশের সুযোগ করে দেয়। তাছাড়া চিঠিপত্র কলাম পাঠককে সম্পাদকীয় পাতা সম্পর্কে আগ্রহী করে তোলে এবং এর পাঠক সংখ্যা বাড়ায়।

প্রভিডেন্স জার্নাল বুলেটিন-এর চিঠিপত্র কলামের সম্পাদক পিটার জি ফ্রাডলে বলেছেন- "সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি চিঠি হলো অন্ধকারের মধ্যে একটি ছোট্ট আলোর শিখা যার মাধ্যমে সাধারণ জনগণের চাহিদা ও ইচ্ছার কথা পৌঁছায় শাসকদের কাছে।" প্রকৃতপক্ষে সংবাদপত্রের চিঠি-পত্রের মাধ্যমে পাঠক যা বলতে চায় তা বলার সুযোগ পায়। এক্ষেত্রে পাঠককে যে সম্পাদকের কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত হতে হবে তা নয়। এ কারণে এসকল চিঠিতে সম্পাদকের নয় বরং চিঠির লেখক বা সংবাদপত্রের পাঠকের লক্ষ্য ও আদর্শই প্রকাশ পায়। স্যার ব্যারী বিহোমের মতে পাঠকের চিঠিতে সাধারণত জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বিষয়ের বদলে স্থানীয় ও আঞ্চলিক বিষয়ই প্রাধান্য পায়।

সংবাদপত্র ভেদে চিঠিপত্রের সংখ্যা, বিষয় ও ধরন বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। তবে এখনও সম্পাদকীয় পাতার চিঠিপত্র কলামের শ্রেষ্ঠ চিঠিকে প্রাধান্য দেয়া হয়ে থাকে এবং এই প্রাধান্য দেয়ার মাধ্যমে সংবাদপত্র তার পাঠকদের মধ্যে এক ধরনের আগ্রহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করে যা মূলত সম্পাদকীয় পাতার পাঠকদের সংখ্যাই বৃদ্ধি করে।

সংবাদপত্রে চিঠিপত্র প্রকাশের আরেকটি কারণ হলো চিঠিপত্র কলাম সংবাদপত্র ও তার পাঠকের মধ্যে সেতুবন্ধন সৃষ্টি করে। জেমস এ ক্লেনডিনেন (James A Clendinen)-এর মতে "একটি ভালো চিঠিপত্র কলাম সম্পাদকীয় পাতার পাঠক তৈরি করে থাকে।" তিনি মনে করেন স্থানীয় সংবাদপত্রসমূহ পাঠকের চিঠি প্রকাশের মাধ্যমে তাদের মতামতের মূল্য দিতে পারে এবং এভাবে পাঠকদের মাঝে তাদের অবস্থান অনেকটাই দৃঢ় করতে পারে। অনেক সময় পাঠকরা টেলিফোনে তাদের সমস্যার কথা সম্পাদকের কাছে তুলে ধরেন। সম্পাদক তার সংবাদপত্র কর্মীর মাধ্যমে এসকল সমস্যা চিঠির আকারে সংবাদপত্রে প্রকাশ করে থাকেন। এক্ষেত্রে অনেক সময় ঐ টেলিফোনকারী পাঠক এর নাম প্রকাশ করা হয়না। কিন্তু এ চিঠি প্রকাশের মাধ্যমে মূলত ঐ পাঠকের ইচ্ছা ও আদর্শের প্রকাশ করা হয়ে থাকে যা ঐ সংবাদপত্রের প্রতি পাঠকের আস্থা বাড়িয়ে দেয়।

চিঠিপত্র কলামে কারা লেখে

সম্পাদকীয় পাতায় চিঠিপত্র কলামে লিখে থাকেন সাধারণত ঐ সংবাদপত্রের পাঠকশ্রেণী। এই শ্রেণী মূলত সমাজের শিক্ষিত, সচেতন ও বুদ্ধিমান পাঠক। সাধারণত সমাজের বিভিন্ন সমস্যা, রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে এ সমস্ত চিঠি লেখা হয় এবং এসকল চিঠিতে

www.pathagar.com

সমস্যার সমাধান চাওয়ার পাশাপাশি অনেক সময় দিকনির্দেশনামূলক তথ্যও থাকে যা পাঠকের সচেতনতা ও বুদ্ধির পরিচয় দেয়।

চিঠি প্রকাশযোগ্য করে তোলা

সকল সংবাদপত্রের চিঠিপত্র সেকশন বড় নয়। অনেক সম্পাদক বলে থাকেন যে, তারা কখনই অনেক বেশি চিঠি পাননা। অনেকে বলেন, যে সকল চিঠি তারা পেয়ে থাকেন তার অধিকাংশই নিম্নমানের এবং একই বিষয়ে নিয়ে লেখা অথবা ঐ চিঠির বিষয়বস্তু খুব কম আকর্ষণীয়। এ কারণে সংবাদপত্রের সম্পাদকদের চেষ্টা থাকে কিভাবে সুন্দর ও সাবলীল চিঠি প্রকাশ করা যায়। এ উদ্দেশ্যে সংবাদপত্রের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কতকগুলো পদক্ষেপ নিয়ে থাকেন। এগুলো হলো-

- সাধারণ জনগণের যে বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ নেই সে সমস্ত চিঠি বাছাই করে ফেলে দেয়া।
- চিঠিকে আরো বেশি নাটকীয়ভাবে উপস্থাপন করা।
- চিঠি লেখার জন্য সমাজের সচেতন ও বুদ্ধিমান পাঠককে আমন্ত্রণ জানানো।
- টেলিফোন বা ফ্যাক্স জাতীয় সহজ উপায়ের মাধ্যমে যাতে পাঠক তার চিঠি পাঠাতে পারে তার ব্যবস্থা করা।
- নিয়মিত লেখকদের জন্য চিঠির বিষয়বস্তু সম্পর্কে উপদেশ দেয়া।
- সুন্দর ও সাবলীল চিঠি লেখার জন্য পুরস্কার দেয়া।

চিঠিপত্র কলামকে আকর্ষণীয় করার জন্য আরেকটি কাজ করা হয়। তা হলো নীতি বা আদর্শের প্রতিফলন ঘটে এমন চিঠি সংবাদপত্রের লোকেরা নিজেরা লিখে প্রকাশ করে থাকে। কারণ কেবলমাত্র এ পন্থার ভিত্তিতেই কোনো সংবাদপত্রে ভালো চিঠি আসতে পারে। কারণ কোনো সুন্দর ও সাবলীল চিঠি পড়ার মাধ্যমে পাঠকরা সুন্দর চিঠি লিখতে উৎসাহ বোধ করে।

পাঠকের লেখা চিঠি গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করার মাধ্যমে মূলত পাঠককেই সম্মান জানানো হয়। চিঠির শিরোনাম কিছুটা বড় টাইপ এর মাধ্যমে প্রকাশ করে একটি চিঠি থেকে আরেকটি চিঠিকে আলাদা করা হয়। অনেক সময় শ্রেষ্ঠ চিঠিকে বক্স আকারে প্রকাশ করে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়। বর্তমানে অনেক সংবাদপত্রই প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেষ্ঠ চিঠি বাছাই করে এবং তাদেরকে পুরস্কৃত করে। প্রকৃতপক্ষে এসকল কিছুই করা হয় চিঠিপত্র কলামকে আরও সুন্দর ও সাবলীলভাবে উপস্থাপনের জন্য।

www.pathagar.com

চিঠিপত্র কলাম এবং সম্পাদকীয় নীতিমালা

সংবাদপত্রের চিঠিপত্র কলাম পাঠকরা কতটুকু পড়বে এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে তারা কতটুকু সাড়া দেবে তা নির্ভর করে সংবাদপত্রে যে সমস্ত চিঠি আসে তার বাছাই এবং ট্রিটমেন্ট এর উপর। চিঠিপত্র কলামের মান এবং এই কলাম সম্পর্কে পাঠকদের অনুধাবনকে প্রভাবিত করে সংবাদপত্রের নীতিমালা। এ কারণে সম্পাদকগণ চিঠিপত্র কলামের জন্য যেসকল নীতিমালা সবচেয়ে বেশি যথাযথ চিঠিপত্রে সে ধরনের নীতিমালা বজায় রয়েছে কিনা তা যাচাই করেন এবং সে অনুযায়ী চিঠিপত্র প্রকাশের অনুমতি দেন অথবা, অসম্মতি প্রকাশ করেন। চিঠির ক্ষেত্রে লেখকের নাম ও ঠিকানা, নামের সত্যতা, বিষয়বস্তু, চিঠির আকার সম্পাদনা এবং সম্পাদকের নোট এ সকল ক্ষেত্রে এই নীতিমালার প্রয়োগ দেখা যায়।

নাম ও ঠিকানা

চিঠিপত্র কলামে লেখকের নাম ও ঠিকানা প্রকাশিত হবে কি হবে না তা নিয়ে বিতর্ক চলে আসছে বহু দিন ধরে। কিছু-কিছু সম্পাদক লেখকের নাম ও পূর্ণ ঠিকানা উভয়ই প্রকাশ করার পক্ষপাতি। কেউ কেউ আছেন যারা মনে করেন নামের সাথে কেবলমাত্র জায়গার নাম প্রকাশ করা যায়। আবার কারো কারো মতে কেবলমাত্র নাম প্রকাশ করা যেতে পারে।

নাম ও ঠিকানা প্রকাশের ব্যাপারে প্রকৃতপক্ষে তেমন কোনো কঠোর বিধিমালা মেনে চলা হয়না। তবে বিশ্বাস করা হয় যে চিঠিপত্রের মান বাড়বে তখনই যখন কোনো লেখক জানবে যে তিনি যা লেখেন তার সঙ্গে জনগণের সম্পৃক্ততা রয়েছে। এ ধরনের বিশ্বাস চিঠিপত্র কলামের সম্পাদকের দায়িত্ব বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। নাম ও ঠিকানা প্রকাশের পক্ষে একটি যুক্তি হলো কোনো মতামত ততক্ষণ পর্যন্ত বৈধ ও গ্রহণযোগ্য হয়না যতক্ষণ পর্যন্ত না পাঠক তার উৎস সম্পর্কে জানে।

কোনো চিঠিতে নাম প্রকাশের মাধ্যমে পাঠকদেরকে বোঝানো হয় যে চিঠির লেখক জানে জনগণ কী বিষয়ে কথা বলছে বা বর্তমানে জনগণের আলোচ্য বিষয় কী। এ কারণে সংবাদপত্রে প্রচুর চিঠি আসলেও চিঠি প্রকাশের ক্ষেত্রে লেখকের নাম ও ঠিকানাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে ধরা হয়।

তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে চিঠি লেখকের নাম ও ঠিকানা প্রকাশ করা উচিত নয় বলে কোনো কোনো সম্পাদক মনে করেন। কারন চিঠির বিষয়বস্তু বিতর্কিত হলে চিঠির লেখক নিজেও বিতর্কিত হয়ে পড়তে পারেন যা তার ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে প্রভাব ফেলতে পারে। আবার অনেক ক্ষেত্রে লেখক তার ব্যক্তিগত সমস্যার কথা জানিয়ে চিঠি লেখেন।

www.pathagar.com

অথবা তার সাথে সম্পৃক্ত কারো দুর্নীতির কথা প্রকাশ করেন। এ দুটি ক্ষেত্রেই লেখকের নাম ও ঠিকানা প্রকাশ পেলে তার ওপর আক্রমণ আসতে পারে বা তার ব্যক্তিগত জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠতে পারে। এক্ষেত্রে সম্পাদকের উচিত লেখকের নাম ঠিকানা প্রকাশ না করা অথবা শুধুমাত্র নাম প্রকাশ করা। অবশ্য অনেক সময় লেখক নিজেই তার নাম ও ঠিকানা প্রকাশ না করার অনুরোধ জানায়। এক্ষেত্রে "নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক" এই মর্মে চিঠি প্রকাশ করা যেতে পারে। লেখকের ব্যক্তিগত জীবন যাতে আক্রান্ত না হয় এ কারণে অনেক সম্পাদকই লেখকের নাম প্রকাশ করলেও তার ঠিকানা প্রকাশ করেন না।

তবে প্রকৃতপক্ষে নাম ও ঠিকানা কোনো চিঠির গুরুত্ব অনেকখানি বাড়িয়ে দেয় যা নাম বিহীন একটি চিঠি পারে না। হেরাল্ড ট্রিবিউন এর লুরি জোসলিস (Lawrie Joslin) বলেন, আমার অভিজ্ঞতায় বলে যে, সুনির্দিষ্ট পরিচিতি কোনো চিঠির গুনগত মানকে বৃদ্ধি করে। তার মতে "নামসহ কোনো চিঠি অনেক বেশি বিশ্বাসযোগ্য, নামবিহীন অনেক চিঠির চেয়ে"।

নামের সত্যতা যাচাই

সংবাদপত্রে যেসকল চিঠি আসে তার অধিকাংশগুলোতেই নাম ও ঠিকানা থাকে। অনেক ক্ষেত্রে পাঠকের টেলিফোন নাম্বারও চিঠির সাথে দেয়া থাকে। কোনো চিঠি প্রকাশের আগে সম্পাদকের উচিত চিঠির সত্যতা যাচাই করা। অর্থাৎ যিনি চিঠি পাঠিয়েছেন তিনি সত্যি ঐ ঠিকানায় থাকেন কি না তা যাচাই করা এবং চিঠিতে নাম ও ঠিকানা প্রকাশে তার আপত্তি রয়েছে কি না তা জানা। এজন্য সম্পাদক প্রদত্ত ঠিকানায় খোঁজ নিয়ে সত্যতা যাচাই করতে পারেন। অবশ্য ঠিকানার মাধ্যমে চিঠির প্রেরক সম্পর্কে জানা যথেষ্ট ঝক্কির ব্যাপার। কারণ প্রথমত এটা যথেষ্ট সময় সাপেক্ষ বিষয়। চিঠির লেখককে খুঁজে বের করা ও তার যথার্থতা যাচাইয়ে প্রচুর সময় ব্যয় করতে হয়। যার ফলে ঐ চিঠি প্রকাশে অনেক দেরি হয়ে যেতে পারে। অনেক সময় চিঠির বিষয় এতটাই তাৎক্ষণিকতাপূর্ণ থাকে যে সম্পাদকের দেরি করার মতো হাতে যথেষ্ট সময় থাকেনা। এ কারণে যদি ফোন নাম্বার পাওয়া যায় তবে ফোনে নামের সত্যাসত্য পরীক্ষা করে নেওয়াই শ্রেয়। অবশ্য চিঠির লেখকের যদি একাধিক ফোন না থাকে এবং ফোনকালীন সময়ে ঐ নাম্বারে কেউ উপস্থিত না থাকে তবে যাচাইকরা কঠিন হয়ে পরে।

অনেক সম্পাদকের প্রবণতা হলো টেলিফোন বা লিখিত ঠিকানার পেছনে অযথা সময় নষ্ট না করা। এ সমস্ত সম্পাদকের কাছে চিঠির পাঠক ও লেখকদের নাম ঠিকানা যুক্ত ফাইল থাকে। অনেক সময় এতে পাঠকের হাতের স্বাক্ষরও থাকে। এ ধরনের ফাইলের সিস্টেমে খুব দ্রুত লেখকের নামের যথার্থতা পরীক্ষা করা সম্ভব হয়।

www.pathagar.com

যদি কোনভাবেই লেখকের নাম ও ঠিকানার যথার্থতা নির্ণয় করা সম্ভব না হয় তবে সম্পাদক-এর উচিত ঐ চিঠি প্রকাশ না করা। কারণ এতে করে সম্পাদক মানহানির দায় এড়াতে পারবেন।

বিষয় নির্ধারণ

কোনো চিঠির আইনসঙ্গত বৈধতা নিয়ে নিশ্চয়তা পাওয়া গেলে পরবর্তী কাজ হলো চিঠির বিষয়বস্তু যথাযথ কি-না তা যাচাই করা। প্রতিটি সংবাদপত্রেরই কী প্রকাশের ব্যাপারে লিখিত, অলিখিত কিছু নীতিমালা রয়েছে। বেশিরভাগ সংবাদপত্রই সাধারনত কোনো শব্দ বা বক্তব্যের অর্থ বুঝাতে ধর্মীয় যুক্তিকে এড়িয়ে চলে। তবে জনগণ সম্পর্কিত কোনো বিষয় হলে সেক্ষেত্রে আবার অনেক সময় কোরান বা বাইবেলে ব্যাখ্যা প্রকাশের অনুমতি দেয়া হয়। কোনো বিশেষ ইস্যুতে জনগণের আগ্রহ না জাগা পর্যন্ত অধিকাংশ পত্রিকা সাধারণত ঐ বিষয়ে লেখা চিঠি প্রকাশ করেনা। অনেক সম্পাদকই তাদের সার্কুলেশন এলাকার বাইরে থেকে পাঠানো কোনো চিঠি প্রকাশ করেনা। অবশ্য তা যদি পত্রিকার বা সার্কুলেশন এলাকার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোনো চিঠি হয় তবে তা প্রকাশ করে থাকেন সম্পাদক। নৈতিকতার সাথে জড়িত বিশেষত যৌনতা ও নগ্নতা নিয়ে চিঠি প্রকাশের ক্ষেত্রে সম্পাদকরাও অনেক সময় নেন। এক্ষেত্রে কোনো একটি বা দুটি চিঠি এলেই সম্পাদক তা প্রকাশ করেন না। বরং তিনি লক্ষ করেন ঐ বিষয় নিয়ে আর কোনো চিঠি আসে কি-না অযথা ঐ বিষয়ে পত্রিকার কলাম বা প্রবন্ধ ছাপা হচ্ছে কি না। যদি তিনি দেখেন ঐ বিষয়ে একাধিক কলাম বা প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে তখন তিনি ঐ বিষয়ে চিঠি প্রকাশের উদ্যোগ নেন। এক্ষেত্রে যদি ২০টি চিঠি এসে থাকে তবে তিনি তার মধ্যে থেকে সবচেয়ে সাবলীল ও সুরুচিপূর্ণ চিঠিসমূহ বাছাই করে তা প্রকাশের ব্যবস্থা করেন।

চিঠির আকার ও দৈর্ঘ্য

অধিকাংশ সংবাদপত্র চিঠির দৈর্ঘ্য ২০০ থেকে ৩০০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধা রাখে। আমাদের দেশে বিভিন্ন সংবাদপত্রগুলোতে এই প্রবণতা লক্ষ করা যায়। দৈনিক প্রথম আলোর চিঠির আকার সাধারণত ১৫০ থেকে ২০০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। অন্যদিকে দৈনিক ইত্তেফাক এর চিঠির শব্দসীমা ১০০ থেকে ৩০০। ১৯৭০ সালে প্রকাশিত এক জরিপে দেখা গেছে অধিকাংশ সংবাদপত্রই ২০০ থেকে ৫০০ শব্দের মধ্যে লেখা চিঠি প্রকাশের অনুমোদন দেয়। তবে সাধারনত ২৫০ থেকে ৩০০ শব্দের চিঠিই প্রকাশিত হয় বেশির ভাগ সংবাদপত্রের চিঠিপত্র কলামে। সংবাদপত্র যদি তার সংবাদপত্রে প্রকাশিত চিঠির আকার নির্ধারণ করে দেয় তবে চিঠির লেখকরাও সংক্ষিপ্ত করে লিখতে বাধ্য হয়। যা সম্পাদকের সময় অনেকটা বাঁচায়।

www.pathagar.com

চিঠি সম্পাদনা

সংবাদপত্রে যে সকল চিঠি আসে তার অধিকাংশই নিম্নমানের। সম্পাদকের দায়িত্ব হলো ঐ নিম্নমানের চিঠিকে মানসম্পন্ন করে তোলা। এ জন্য সম্পাদক চিঠি বাছাই করে তা সম্পাদনায় হাত দেন। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় সম্পাদক চিঠির বক্তব্য ঠিক রেখে ভাষা পুরোপুরি পাল্টে ফেলেন। এর কারণ অনেক সময় এমন অনেক পাঠক চিঠি লেখেন যারা হচ্ছেন অশিক্ষিত বা কম শিক্ষিত। তবে তাদের মেধা ও নিজস্ব দর্শন রয়েছে। চিঠির বক্তব্যে ঐ দর্শনের প্রকাশ ঘটে। কিন্তু শিক্ষা কম থাকায় তাদের ব্যাকরণগত ও ভাষাগত ভুল থেকে যায়। সম্পাদকের দায়িত্ব হলো তাই লেখকের দর্শন ও বক্তব্য ঠিক রেখে চিঠির ভাষার পরিমার্জন করা। ফ্র্যাংক গ্রিমস এর মতে "অনেক কম লেখাপড়া জানা মানুষের অভূতপূর্ব মেধা রয়েছে। এ ধরনের লোকের শুধুমাত্র হয়ত শব্দগুলো জানা আছে তবে কিভাবে সেগুলো সাজিয়ে একটি পূর্ণ অর্থ দাঁড় করাতে হয় তা জানা নেই। কিন্তু তাদের ধ্যান-ধারণা তাদের বক্তব্য সত্যিই জ্ঞানী লোকের মতো।" এ কারণে গ্রিমস এর মত হলো এসকল লোকের লেখা এমনভাবে সম্পাদনা করা উচিত যাতে করে তাদের বক্তব্য অক্ষত থাকে। প্রকৃতপক্ষে বেশিরভাগ লেখার বানান ভুল, ব্যাকরণগত ভুল ও ভাষাগত অশুদ্ধতা দূর করলেই ছাপানো সম্ভব হয়। একটি সুন্দর ও সাবলীল সম্পাদনার হাতই কেবল পারে নিরপেক্ষতা ও সংবেদনশীলতা বজায় রাখতে।

সম্পাদকের নোট

প্রকৃতপক্ষে চিঠিপত্র কলামে সম্পাদকের নোট চিঠিপত্র কলামের লেখক ও পাঠকের সাথে পত্রিকার একটি বন্ধন তৈরি করে। এর মাধ্যমে অনেক সময় চিঠি-পত্রের লেখক ও পাঠকরা তাদের লেখা সম্পর্কে সম্পাদকের বক্তব্য পেয়ে যান। যার ফলে সম্পাদক ও পাঠকের মতামতের আদান-প্রদান ঘটে। তবে এক্ষেত্রে সম্পাদককে লক্ষ রাখতে হবে তিনি যেন উপদেশ না দেন বা তার নোট যেন সর্বশেষ বক্তব্যে পরিণত না হয়। কারণ পাঠক/লেখক যদি বোঝে যে সম্পাদকের বক্তব্যই সর্বশেষ কথা তবে তারা চিঠি লেখা ছেড়ে দেবে। এক্ষেত্রে সম্পাদকের কাজ হলো কারো অনুভূতিতে আঘাত করে এমন কোনো নোট না দেয়া এবং নিরপেক্ষতা বজায় রাখা। শুধু নিরপেক্ষতা নয় সম্পাদকের উচিত পত্রিকার নীতিমালা যাতে বজায় থাকে সেদিকেও লক্ষ রাখা।

প্রকৃতপক্ষে একটি সুন্দর ও সফল চিঠিপত্র কলামের পেছনে এসকল অনেক বিষয় কাজ করে। কোনো চিঠি প্রকাশ হবে কি না বা লেখাকে প্রকাশযোগ্য করার জন্য কী করা উচিত তা পুরোপুরি নির্ভর করে এই কলামের দায়িত্বপ্রাপ্ত সম্পাদকের মেধা, যোগ্যতা ও বিচার শক্তির ওপর।

www.pathagar.com

সিন্ডিকেট কলাম

আধুনিক তথ্য সমাজে সিন্ডিকেট কলামের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। একই ব্যক্তির একই বিষয়ে লেখা একাধিক কাগজে ছাপা হলে তাকে সিন্ডিকেট কলাম বলে। আধুনিক সংবাদপত্রসমূহে এখন আর তেমন একটা "উপ-সম্পাদকীয়" বা Post-editorial দেখা যায় না। তার বদলে আধুনিক সংবাদপত্রসমূহ সিন্ডিকেট কলাম লেখকদের লেখা প্রকাশ করে থাকে। সিন্ডিকেট কলামে সাধারণত দেশ-বিদেশের প্রখ্যাত মনিষী ও সাংবাদিকরা লিখে থাকেন। এতে তাদের ব্যক্তিগত অভিমত ও চিন্তাচেতনা প্রকাশ পায়।

সিন্ডিকেট কলাম এর এই উত্থান ১৯৩০ এর দশকে। তখন সারা পৃথিবী জুড়ে অর্থনৈতিক মন্দা চলছিল। বিভিন্ন বিষয়ে সরকার কী সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, অর্থনৈতিক বিষয়ে বিভিন্ন নতুন চুক্তি ইত্যাদি বিষয়ে জনগণ কোনো নির্দিষ্ট সংবাদপত্র বা সুনির্দিষ্ট লেখকের বক্তব্য বিস্তারিতভাবে জানতে চাইতো। অথচ সাধারণ সংবাদ, সম্পাদকীয় ও উপ-সম্পাদকীয়তে এ বিষয়গুলো বিশ্লেষণমূলকভাবে আসতো না। জনগণের এই জানার আকাঙ্খা থেকেই "সিন্ডিকেট কলাম" এর উত্থান।

সিন্ডিকেট কলাম এর উত্থান এর পেছনে আরেকটি কারণ হলো পত্রিকার স্বার্থ। সংবাদপত্রকে সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয় লেখকদের একটি বিরাট অংকের বেতন দিতে হয়। অথচ সিন্ডিকেট কলামিস্টরা নামমাত্র মূল্যের সম্মানীর বিনিময়ে লেখা দিয়ে থাকেন। কোনো অর্থের লোভে নয় কেবলমাত্র কোনো গুরুত্বপুর্ণ বিষয়ে তাদের ব্যক্তিগত অভিমত ও যুক্তি প্রদানের জন্যই সিন্ডিকেট কলামিস্টরা লিখে থাকেন। এসকল কলামের কারণে সম্পাদকরাও তাদের পাঠকদের বিভিন্ন চিন্তা-ধারা, নতুন দিকনির্দেশনা ও নতুন নতুন অভিমতের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে পারেন, যা উপ-সম্পাদকীয়তে সম্ভব নয়।

সিন্ডিকেট কলাম জনপ্রিয় হবার আরেকটি বাস্তব কারণ হলো বেশিরভাগ সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় লেখকরা নিজেদের লেখার মানকে সমৃদ্ধ করেননা বা করার চেষ্টাও করেন না। অনেকসময় অবাধ লেখার স্বাধীনতা থাকায় তারা তেমন একটা লেখাও দেননা। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই অনেক বিখ্যাত সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় কলাম বা উপ-সম্পাদকীয় যেনতেনভাবে লেখা হয়, যা মূলত ধীরে ধীরে ঐ পত্রিকার সুনাম নষ্ট করে। এসকল কারণে বর্তমানে সিন্ডিকেট কলামের জনপ্রিয়তা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে পাঠক ও পত্রিকার মালিক উভয়ের কাছেই।

কলাম বাছাই করা

একটি সংবাদপত্রে প্রতিদিন বিভিন্ন শ্রেণীর লেখক বিভিন্ন বিষয়ে তাদের লেখা পাঠিয়ে থাকেন। এর মাঝে থেকে সম্পাদক বাছাই করেন কোনগুলো সিন্ডিকেট কলাম হিসেবে

www.pathagar.com

পত্রিকায় যাবে। অবশ্য অনেক সময় বিখ্যাত ব্যক্তিদের লেখা পাওয়া মাত্রই সেটা সিন্ডিকেট কলাম হিসেবে বিবেচিত হয়। তবে সাধারণত কলাম বাছাই এর সময় সম্পাদক সবচেয়ে প্রথমে দেখেন কলামটিতে পত্রিকার নীতিমালা বজায় রয়েছে কি না। এর পর দেখা হয় কলামটি সংবাদপত্রের পাঠকের চাহিদা পূরণ করছে কি না। অর্থাৎ সংবাদপত্র যে বিষয়ে নিয়ে কথা বলতে চায় তার সঙ্গে ঐ বিষয়বস্তুর মিল রয়েছে কি না। সবশেষে সম্পাদক লক্ষ্য করবেন কলামটি যৌক্তিক কি না। অর্থাৎ কলামটিতে বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে কি না।

অনেকসময় দেখা যায়, সংবাদপত্র নির্দিষ্ট ও নামকরা কলামিস্টদের লেখাই কেবল ছাপে। এজন্য সংবাদপত্রে সাধারণত বিখ্যাত কলামিস্টদের তালিকা তৈরি থাকে। এ সকল কলামিস্টদের মধ্যে যাদের লেখার বিষয়বস্তুর সঙ্গে সংবাদপত্রের বক্তব্যের মিল রয়েছে, সংবাদপত্রের নীতিমালার সাদৃশ্য রয়েছে কেবলমাত্র তাদের লেখাই সংবাদপত্র ছাপে।

অবশ্য সকল বিখ্যাত কলামিস্টদের লেখা যে সবসময় সহজলভ্য তা নয়। এজন্য অনেক সময় একটু কম বিখ্যাত লেখকদের লেখাও সংবাদপত্র ছাপে। অনেক সময় দেখা যায় কলাম লেখক বিখ্যাত কেউ নন কিন্তু তার লেখাটি যথেষ্ট যৌক্তিক ও বিষয়বস্তু সংবাদপত্রের নীতিমালার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। সেক্ষেত্রে যদি কোনো বিখ্যাত কলামিস্ট-এর লেখা না পাওয়া যায় তবে সম্পাদক ঐ লেখাটি সিন্ডিকেট কলামে ছাপতে পারেন।

কলাম বাছাইয়ের সময় আরেকটি গুরুত্বপুর্ণ বিষয়ের প্রতি সম্পাদকের লক্ষ রাখতে হয় তাহলো কলামের শব্দসীমা কত আছে। অনেক সময় দেখা যায় লেখার বিষয়বস্তু ও লেখার মান খুবই ভালো এবং লেখকও নামকরা বিজ্ঞজন কিন্তু শব্দসীমা অনেক বেশি। এক্ষেত্রে সম্পাদক ঐ লেখককে পুনরায় লেখা পাঠিয়ে শব্দসংখ্যা কমিয়ে দেবার জন্য বলতে পারেন। অথবা নিজেই কলামের লেখা কাট-ছাঁট করে তা নির্দিষ্ট শব্দসীমার মধ্যে আনতে পারেন। তবে তা করতে গিয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নষ্ট হয়ে যেতে পারে। একারণে কলাম লেখকদের শব্দসীমা সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া সম্পাদকের দায়িত্ব।

সিন্ডিকেট কলামের আকার

আধুনিক সংবাদপত্রগুলোতে সিন্ডিকেট কলামের জন্য যে জায়গা নির্ধারিত থাকে তা সাধারণত ৭০০ থেকে ১০০০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ওয়াশিংটন পোস্টের সিন্ডিকেট কলামের জন্য নির্ধারিত শব্দসীমা হলো ৯০০ থেকে ১২০০। তবে "ওয়াশিংটন পোস্ট" এর সিন্ডিকেট কলাম লেখক জর্জ এফ উইল-এর মতামত হলো- সংবাদপত্রের ব্যস্ত পাঠকদের জন্য ৭০০ শব্দের কলাম হলো সবচেয়ে যথার্থ এবং সঠিক পছন্দ, এবং ১২০০ শব্দের লেখা কখনই পছন্দসই নয়।

www.pathagar.com

কার্টুন

আধুনিক সংবাদপত্রের একটি গুরুত্বপুর্ণ বিষয় হলো কার্টুন বা ব্যঙ্গচিত্র। কোনো জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে অত্যন্ত হালকা ও ব্যঙ্গাত্মকভাবে পাঠকের কাছে উপস্থাপন করে কার্টুন। এ কারণে সংবাদপত্রের অন্যান্য পাতার ন্যায় গুরুগম্ভীর ও পান্ডিত্যপুর্ণ সম্পাদকীয় পাতায়ও আজকাল কার্টুনের ব্যবহার হচ্ছে।

গুরুগম্ভীর ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তব্যের সাথে হালকা মেজাজের কার্টুন সম্পাদকীয় পাতার একঘেয়েমি দূর করে তা পাঠকের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলে।

সম্পাদকীয় পাতায় কার্টুন ব্যবহার কতটা প্রয়োজনীয়

অনেক সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় পাতায় যে কার্টুন দেয়া হয় তার সঙ্গে সম্পাদকীয় নীতিমালা বা সম্পাদকীয় পাতার বিষয়বস্তু যেমন সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয়, চিঠিপত্র ইত্যাদি কোনো কিছুরই সামঞ্জস্য থাকেনা। আবার অনেক সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় পাতায় কার্টুন ছাপার কারণ হলো সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ মনে করে প্রত্যেক পাতায় কিছু পরিমাণ চিত্রশিল্পের কাজ থাকা উচিত।

প্রকৃতপক্ষে কোনো পাতায় কার্টুন বা ব্যঙ্গচিত্র থাকলে সে পাতাটি হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত ও আকর্ষণীয়। মূলত এটি হলো সম্পাদকীয় পাতার কার্টুন দেবার পক্ষে সবচেয়ে যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা এবং সম্পাদকরা সবসময় এই যুক্তিই প্রদান করেন। কার্টুনের আরেকটি কাজ হলো সম্পাদকীয় পাতার পাঠকের কাছে গুজব পৌঁছে দেয়া। অনেক সময় সংবাদপত্র এমন কিছু কলাম তুলে ধরে যার মধ্যে যুক্তিসঙ্গত উপস্থাপন খুব কম। যার ফলে তা সম্পাদকীয় পাতার ভাবমূর্তি নষ্ট করে তার পাঠকের কাছে। সংবাদপত্র তাই তার জ্ঞানী পাঠকদের ধরে রাখার জন্য কার্টুনের মাধ্যমে সমাজে প্রচলিত গুজব উপস্থাপন করে। এতে করে পত্রিকার ভারসাম্যও বজায় থাকে। কারণ গুজব অনেকসময় অনেক অপছন্দনীয়, নিন্দনীয় যুক্তিকেও পাঠকের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলে।

কার্টুনের মাধ্যমে পাঠক অনেক সময় অনেক অমিমাংসিত প্রশ্নের জবাব পেয়ে থাকেন। তবে অধিকাংশ কার্টুনে তেমন একটা সত্য তথ্য থাকেনা যা দ্বারা পাঠকরা উদ্বুদ্ধ হয়ে বিতর্কিত বিষয়ে যুক্তিসঙ্গত কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারে। তবে এ ধরনের গুজবও (যার স্বপক্ষে কোনো যুক্তি নেই) অনেক কট্টর বিরোধী মতাবলম্বীকে অনেকটা নরম করে তোলে। অবশ্য বেশির ভাগ সময় রাজনৈতিক কার্টুনকে কোনো মতের স্বপক্ষে জোরালো যুক্তি হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। অন্যদিকে এ ধরনের রাজনৈতিক কার্টুন বিরোধী পক্ষকে আরো বেশি বিরোধী ও মারমুখী করে তোলে।

www.pathagar.com

সম্পাদকীয় পাতায় কার্টুন দেবার সময় একটা জিনিস সব সময় মনে রাখতে হবে তাহলো কার্টুনটি যেন প্রধান সম্পাদকীয়-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। সংবাদপত্রের নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কার্টুনও দেয়া যেতে পারে সম্পাদকীয় পাতায়। কিন্তু অনেক সম্পাদক আছেন যারা সম্পাদকীয়-এর দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা না করে কেবলমাত্র পাঠক ধরে রাখার মনোভাব থেকে সামঞ্জস্যহীন কার্টুন তুলে ধরেন। যা প্রকৃতপক্ষে পাঠকের সংখ্যা বৃদ্ধির বদলে পাঠকের পরিমাণ কমিয়ে দেয়।

এ কারণে অনেক সম্পাদক আছেন যারা সম্পাদকীয় পাতায় কার্টুন না দিয়ে সম্পাদকীয় পাতার আরেকটি অংশ "মুক্তচিন্তা" বা "মুক্ত কলাম" বা open-page এ কার্টুন দিয়ে থাকেন। তারা এটি করে থাকেন সম্পাদকীয় পাতার ভাবগাম্ভীর্য ও মর্যাদা বজায় রাখার জন্য। এব্যাপারে লস এ্যাঞ্জেলস টাইম্‌স-এর কার্টুনিস্ট পল কনরাড এর মতামত হলো "আমি মনে করি এটি একটি ভালো কাজ। কারণ আমি মনে করি মুক্ত কলাম অধিকতর ভালো জায়গা কার্টুন প্রকাশের জন্য।" কার্টুনকে মুক্ত কলামে স্থানান্তরের পেছনে একটি কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন সম্পাদকীয় পাতায় চিঠিপত্র কলামের জন্য আরো জায়গা বের করা। তার মতে আরেকটি কারণ হলো সম্পাদকীয় লেখনীই যে সংবাদপত্রের মতামত প্রকাশের একমাত্র জায়গা তা তুলে ধরা।

কার্টুন নির্বাচন

সংবাদপত্রে বেতনভুক্ত কার্টুনিস্ট থাকবে কি না তা নির্ভর করে সংবাদপত্রটি কেমন চলছে তার ওপর। যেসকল সংবাদপত্রের সার্কুলেশন ভালো সাধারণত তাদের নিজস্ব এক বা একাধিক কার্টুনিস্ট থাকে। তবে অনেক সময় ক্ষুদ্র সংবাদপত্রের সাথে সাথে ভালো এবং বৃহৎ সার্কুলেশনের সংবাদপত্রেও বেতনভুক্ত কার্টুর্নিস্ট থাকে না। এসকল ক্ষেত্রে বিখ্যাত কার্টুনিস্টদের কার্টুন সংবাদপত্র ছেপে থাকে। এসকল কার্টুনকে সিন্ডিকেট কার্টুন বলে। অনেক সময় সংবাদপত্রের নিজস্ব কার্টুনিস্ট ছুটিতে থাকলে এসকল সিন্ডিকেট কার্টুনিস্ট-এর কার্টুন ছাপায় সংবাদপত্র। কারণ এসকল সিন্ডিকেট কার্টুন কোনো পাতাকে উজ্জল করে তোলে। সিন্ডিকেট কার্টুনিস্ট সম্পাদকীয় মন্তব্যের একাধিক চিত্র তুলে ধরে পাঠকদের সামনে। সম্পাদক বা সম্পাদকীয় পাতার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে এসকল কার্টুনিস্টদের একাধিক কার্টুন থাকে বাছাই করার জন্য। জর্জিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আর্নেষ্ট. সি. হাইন্ডস-এর মতে, এডিটর এন্ড পাবলিশার এর বর্ষ বিবরণী বইতে ২০০ কার্টুনিস্ট এর তালিকা রয়েছে। এদের মধ্যে দুই তৃতীয়াংশ কার্টুনিষ্ট রাজনৈতিক কার্টুন রচনায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। হাইন্ডস লক্ষ করেছেন যে ২০০ জন কার্টুনিস্ট এর মধ্যে ২৩ শতাংশ কার্টুনিস্ট নিজেদেরকে সিন্ডিকেট কার্টুনিস্ট হিসেবে পরিচয় দেয়। এডিটর এন্ড

www.pathagar.com

পাবলিশার্স এর বার্ষিক বিবরণীতে আরো বলা হয়েছে বেশিরভাগ সময় এ ধরনের সিন্ডিকেট কার্টুন খুব সহজলভ্য।

কার্টুনের সংখ্যা বেশি হলে সংবাদপত্রের সম্পাদক সাধারণত তা থেকে বাছাই করে কার্টুন নির্বাচন করেন। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় কার্টুনের সংখ্যা খুব কম। ৬টা বা তারও কম। তখন সবকটি কার্টুনেরই চাহিদা থাকে সম্পাদকদের কাছে। কার্টুন বাছাই এর ক্ষেত্রে সর্বসময় ক্ষমতার অধিকারী-সম্পাদক। তিনি এমন কার্টুন বাছাই করেন যা তার সম্পাদকীয় পাতার সাথে সামঞ্জস্যপুর্ণ বা যাতে সম্পাদকীয় বক্তব্য ফুটে ওঠে।

ওয়াশিংটন পোস্টের কার্টুনিস্ট হার্ব ব্লক এর মতে ওয়াশিংটন পোস্টের সম্পাদকীয় পাতার কার্টুন মানে হলো "ব্যক্তিগত মতামতের লিখিত প্রকাশ যা সম্পাদকীয় পাতার অন্যান্য বিষয় যেমন কলাম বা প্রবন্ধের মতোই সম্পাদকীয় হতে ভিন্ন কিন্তু তাতে সংবাদপত্রের নীতিমালার প্রকাশ ঘটে।" অনেক সম্পাদকই আছেন যারা কেবলমাত্র নির্দিষ্ট কোনো সিন্ডিকেট কার্টুনিস্ট এর কার্টুনই ছাপেন। এক্ষেত্রে সম্পাদক যে জিনিসটির প্রতি গুরুত্ব দেন তাহলো ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ও পত্রিকার নীতিমালা বজায় রাখা। এসকল ক্ষেত্রে সাধারণত কার্টুনটি হয় ধারাবাহিক বা সিরিজ কার্টুন। অর্থাৎ কোনো একটি গুরুত্বপূর্ণ ও চাঞ্চল্যকর ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত রেখে দুই, তিন বা চার দিনের একটি ধারাবাহিক কার্টুন তৈরি করেন কার্টুনিস্ট। এধরনের কার্টুনে বিনোদনের চেয়ে সামাজিক ও রাজনৈতিক বক্তব্য বেশি থাকে। আবার অনেক সম্পাদক আছেন যারা এই ধারাবাহিকতা পছন্দ করেননা। তারা চান প্রতিদিন নতুন নতুন বিষয় ও বৈচিত্র। সকল ক্ষেত্রেই সম্পাদকীয় পাতার উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করাই হলো মূখ্য বিষয়। যে সম্পাদক প্রতিদিন দুটি কার্টুন ছাপতে চান তাকে অবশ্যই কমপক্ষে চারটি সিন্ডিকেট কার্টুন বাছাই করতে হবে কেনার জন্য। কার্টুন বাছাই এর সময় সম্পাদককে লক্ষ রাখতে হবে কার্টুনটি সময়োপযোগী কি না। কারণ বেশির ভাগ সময় এসকল সিন্ডিকেট কার্টুন আসে ডাকে। অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় ডাক বিভাগের গোলযোগের কারণে বা অন্য কোন কারণে এসকল কার্টুন পত্রিকা অফিসে পৌঁছায় অনেক দেরি করে। কাজেই এক্ষেত্রে সম্পাদক তার দক্ষ ও অভিজ্ঞ চোখের সাহায্যে সময়োপযোগী কার্টুন বাছাই করবেন। আবার অনেক ক্ষেত্রে একই বিষয়ে একাধিক কার্টুনিস্ট কার্টুন এঁকে থাকেন। কাজেই সম্পাদকের লক্ষ থাকবে যেন একই বিষয়ে আঁকা কার্টুনের পুনরাবৃত্তি না ঘটে। অন্য কোনো পত্রিকায় ঐ সিন্ডিকেট কার্টুনিস্ট এর একই বিষয়ে আঁকা কোনো কার্টুন ছাপা হয়েছে কি না তার প্রতিও লক্ষ রাখতে হবে সম্পাদকের। যেসকল সম্পাদক নিজস্ব কর্মীর মেধার যাচাই করতে চান তারা সাধারণত তাদের কর্মীর কাছ থেকেই ভালো কার্টুন বাছাই করেন। অথবা নির্দেশ দেন কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে কার্টুন আঁকার জন্য। এসকল সংবাদপত্রের কর্মীরা সাধারণত স্থানীয় বিষয় নিয়ে কার্টুন এঁকে

www.pathagar.com

থাকেন। এবং তারা আশা করেন যে কোনদিন হয়তো তার আঁকা কার্টুনই তাকে বিখ্যাত করে তুলবে। যেহেতু জাতীয় গণমাধ্যমে স্থানীয় বিষয়কে তেমন একটা বিশ্লেষণ করা হয়না তাই স্থানীয় বিষয়কে কার্টুনের মাধ্যমে বর্ণনা করা খুবই কঠিন। অথচ এই কঠিন কাজটিই করে থাকেন পত্রিকার নিজস্ব কর্মী বা কার্টুনিস্ট। এ ধরনের স্থানীয় বিষয় নিয়ে লেখা কার্টুন সাধারণত অনেক বেশি বিতর্কিত থাকে। এ কারণে এ ধরনের বিষয় বাছাই করার জন্য অনেক সময়ই সম্পাদক ও কার্টুনিস্ট উভয়েই অফিসে ও বাইরে বিতর্কিত হয়ে পড়েন।

কার্টুনটি যদি পাঠকের মনে সাড়া জাগায় (ইতিবাচক বা নেতিবাচক যেটাই হোকনা কেন) তবে তার চেয়ে বেশি আনন্দের, তারচেয়ে বেশি পুরস্কার কার্টুনিস্ট এর কাছে আর কিছুই নয়। একজন দক্ষ ও অভিজ্ঞ স্থানীয় কার্টুনিস্ট কোনো সম্পাদকীয় পাতাকে প্রাণবন্ত করে তোলেন তার কার্টুনের সাহায্যে। ১৯৭২ সালের মে মাসে আমেরিকান প্রেস ইনস্টিটিউট-এর একটি আলোচনা সভায় কিভাবে একজন সাধারণ ও ভালো শিল্পীকে সম্পাদকীয় কার্টুনিস্ট-এ পরিণত করা যায়- এ প্রশ্নের জবাবে ন্যাশনাল কার্টুনিস্ট সোসাইটির সভাপতি এ রোজেন বলেছিলেন "তাকেই বেছে নাও যাকে তুমি কখনই সম্পাদকীয় কার্টুনিস্ট হিসেবে গড়ে তুলবেনা। অথবা যে লোক খুব ভালো ছবি আঁকেনা কিন্তু জনগণের বিষয়ে আগ্রহ রয়েছে তাকেই ভাড়া করো।"

রোজেন যা বলতে চেয়েছেন তাহলো কোনো মাধ্যমে যাচ্ছে তা নয়, বরং কী বিষয় যাচ্ছে পাঠকের কাছে, কোন বার্তা পৌঁছাছে তাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সিন্ডিকেট কার্টুন ও নিজস্ব শিল্পীর কার্টুনের মাধ্যমে সংবাদপত্র মূলত তার আদর্শ ও নীতিমালা প্রচার করে পাঠকের কাছে। প্রকৃতপক্ষে সম্পাদকীয় পাতা হলো সেস্থান যেখানে পাঠক তার কিছু প্রিয় নাম ও মুখের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণ, রাষ্ট্র, জাতি এবং সর্বোপরি পৃথিবীর কিছু অজানা তথ্য জানতে পারে।

উপসম্পাদকীয়

সম্পাদকীয়ের পরে সম্পাদকীয় পাতার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো উপ-সম্পাদকীয়। উপ-সম্পাদকীয়তে পাঠক তার অনেক প্রশ্নের জবাব পেয়ে যান। লেখক নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে নিজের স্বকীয়তায় কোনো ঘটনার বর্ণনা দেন। তিনি বিভিন্ন উদাহরণ টেনে ব্যাখ্যা দান করে ঐ ঘটনার বিশদ বিশ্লেষণ করেন। ফলে লেখকের অজান্তেই তার সাথে পাঠকের সরাসরি হৃদয়ের সংযোগ সৃষ্টি হয়ে যায়।

উপ-সম্পাদকীয়তে সাহিত্য ও শিল্পের সংযোগ সম্ভব যা সম্পাদকীয়তে সম্ভব নয়। উপ-

www.pathagar.com

সম্পাদকীয়তে সাহিত্য ও শিল্পের সংযোগ থাকায় যেকোন বর্ণনা বিশ্লেষণ করার সুযোগ থাকে। ভাষাকে সরল করার জন্য কোনো উপ-সম্পাদকীয় গল্পের মতো করে লিখে থাকেন কলাম লেখকগণ। উপ-সম্পাদকীয়কে তাই সাহিত্যের সমগোত্রীয় হিসেবে উল্লেখ করা যায়।

উপ-সম্পাদকীয় যেহেতু বিশ্লেষণধর্মী কলাম, তাই লেখক এখানে সাহিত্যের সাথে সাথে ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে তুলে ধরতে পারেন। এজন্য কলাম লেখককে যথেষ্ট গবেষণা করতে হয়, প্রচুর পড়াশুনা করতে হয়।

সম্পাদকীয়ের তুলনায় উপ-সম্পাদকীয়তে লেখকরা যথেষ্ট স্বাধীনতা ভোগ করেন। অর্থাৎ সংবাদপত্রের নীতির সাথে সম্পর্ক রেখে অতীত এবং সমকালীন ঘটনার রেফারেন্স দিতে পারেন লেখক। কোনো বিষয়ে যদি লেখক তার আদর্শ ও চিন্তার প্রকাশ ঘটাতে চান তবে উপ-সম্পাদকীয়তে তার প্রকাশ ঘটাতে পারেন লেখক। তবে তাকে অবশ্যই সংবাদপত্রের নীতির সাথে একমত হতে হবে।

সম্পাদকীয় এর মতো উপ-সম্পাদকীয়ও লিখে থাকেন লীডার রাইটার বা সহযোগী সম্পাদকগণ। ইত্তেফাকসহ অনেক সংবাদপত্র রয়েছে যাতে উপ-সম্পাদকীয় লেখা হয় ছদ্মনামে। এ জাতীয় পত্রিকায় সংবাদপত্রের নিজস্ব কর্মী বা লীডার রাইটারগণ ছদ্মনামে উপ-সম্পাদকীয় লিখে থাকেন। অন্যদিকে অনেক পত্রিকার লেখকগণ নিজের নামের সাথে ছবিও ব্যবহার করে থাকেন। ডেইলী স্টার, জনকণ্ঠ, প্রথম আলো এ ধরনের উপ-সম্পাদকীয় প্রকাশ করে।

সাক্ষাৎকার

সাংবাদিকতার শিক্ষক অধ্যাপক সাখাওয়াত আলী খান ও জনাব হাবিবুর রহমান মিলন দীর্ঘদিন ধরে সম্পাদকীয় পাতায় কলাম লিখে আসছেন। সম্পাদকীয় পাতা বিষয়ে দেয়া সাক্ষাতকারে তাদের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটেছে।

অধ্যাপক সাখাওয়াত আলী খান

অধ্যাপক সাখাওয়াত আলী খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের (বর্তমানে) সবচেয়ে প্রবীন শিক্ষক। ১৯৭২ সালে শিক্ষক হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করার আগে দীর্ঘদিন তিনি প্রত্যক্ষভাবে সাংবাদিকতার সাথে জড়িত ছিলেন। ৫৮ সালে দৈনিক বাংলা (সে সময়কার দৈনিক পাকিস্তান) র মধ্য দিয়ে তার সাংবাদিকতা জীবনের শুরু। সাংবাদিকতার শিক্ষক এবং সাংবাদিক উভয় দিক থেকেই তার অভিজ্ঞতার ঝুঁড়ি সমৃদ্ধ। সম্পাদকীয় পাতা ও এর বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তার সুচিন্তিত

www.pathagar.com

ও অভিজ্ঞ মতামত সাংবাদিক সমাজ ও সাংবাদিকতার ছাত্র-ছাত্রীদের উপকৃত করবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

প্রশ্ন ঃ সম্পাদকীয় ও উপসম্পাদকীয় এর মধ্যে মূল পার্থক্য কী বলে আপনি মনে করেন?

সাখাওয়াত আলী খাঁন ঃ সম্পাদকীয় মূলত সম্পাদক বা সংবাদপত্রের কর্তৃপক্ষের বক্তব্য। উপসম্পাদকীয়তে সংবাদপত্রের বক্তব্য থাকলেও এখানে লেখকের বক্তব্য, তার মতামতই প্রধান। মূল পার্থক্য এখানেই।

প্রশ্ন ঃ সম্পাদকীয় পাতার অঙ্গসজ্জা/পৃষ্ঠাসজ্জায় কোনো সুনির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলা উচিত কিনা?

সাখাওয়াত আলী খান ঃ একটা সময় সম্পাদকীয় পাতা ছিল একেবারে সাদামাটা, বাঁধাধরা ছকে ফেলে তখন সম্পাদকীয় পাতা সাজানো হতো। বর্তমানে সম্পাদকীয় পাতার গাম্ভীর্য ও মেজাজ বজায় রেখে প্রতিদিনই তাৎপর্যময় পরিবর্তন হচ্ছে। প্রতিদিনই নতুন নতুন বিষয় সম্পাদকীয় পাতায় যুক্ত হচ্ছে। এর ফলে সম্পাদকীয় পাতায় নতুনত্ব ও বৈচিত্র্য এসেছে যা অত্যন্ত আধুনিক ধারণার প্রতীক বলে আমার মনে হয়। বর্তমানে যুগের পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য তাই সম্পাদকীয় পাতায় কোনো সুনির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলা উচিত নয়।

প্রশ্ন ঃ মতামত কলাম ও সিন্ডিকেট কলাম এর মাঝে কোনো পার্থক্য আছে কি?

সাখাওয়াত আলী খান ঃ মতামত কলাম হলো এক ব্যক্তির লেখা একটি মাত্র কাগজে ছাপা হওয়া কোনো কলাম। অন্যদিকে সিন্ডিকেট কলাম হলো এক ব্যক্তির একই বিষয়ে লেখা বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়া। মূল পার্থক্য হলো বাণিজ্যিক। মতামত কলামের লেখক কেবলমাত্র একটি পাতায় তার লেখা বিক্রি করেন। অন্যদিকে সিন্ডিকেট কলামিষ্ট কোনো সিন্ডিকেট কোম্পানীর কাছে প্রচুর অর্থের বিনিময়ে তার কোনো কলাম বিক্রি করেন যা আবার ঐ কোম্পানী দেশী-বিদেশী বিভিন্ন সংবাদপত্রের কাছে বিক্রি করে থাকে।

প্রশ্ন ঃ একজন বিশেষজ্ঞ হিসেবে আপনার কি মনে হয় বর্তমানে উপ-সম্পাদকীয় এর কোনো প্রয়োজন রয়েছে?

সাখাওয়াত আলী খান ঃ উপসম্পাদকীয়ের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়নি। কোনো বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের জন্য এবং সর্বোপরি লেখকের নিজস্ব দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্যের জন্য সম্পাদকীয় এর আজও প্রয়োজন রয়েছে।

প্রশ্ন ঃ সম্পাদকীয় পাতার মতো গুরুগম্ভীর স্থানে কার্টুনের ব্যবহার কতটা যুক্তিসঙ্গত?

www.pathagar.com

সাখাওয়াত আলী খান ঃ সম্পাদকীয় পাতাকে যে সবসময় গুরুগম্ভীর হতেই হবে তা ঠিক নয়। গাম্ভীর্য ও মর্যাদা বজায় রেখেও এ পাতায় কার্টুনের ব্যবহার করা যায়। কার্টুন এ পাতায় নতুনত্ব ও বৈচিত্র্য আনে। তাছাড়া কার্টুনের বক্তব্য যে সবসময় হালকা হয় তা ঠিক নয়। কার্টুনের মধ্য দিয়েও অনেক সিরিয়াস ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রকাশিত হতে পারে।

প্রশ্ন ঃ বর্তমানে অনেক পত্রিকাই মুক্তচিন্তা নামে একটি পাতা বের করে। এ পাতাকে কি সম্পাদকীয় পাতার অংশ বলা যায়?

সাখাওয়াত আলী খান ঃ মুক্তচিন্তাকে প্লাটফর্ম অব ফোরাম বলা যেতে পারে। প্রকৃতপক্ষে এটি সংবাদপত্রের পাঠক বৃদ্ধির একটি কৌশল। পাঠকরা এটি পড়বে এবং তা থেকে বিতর্কের সৃষ্টি হবে, নতুন মতামতের সৃষ্টি হবে। অনেকটা চিঠিপত্র কলামের মতো। তবে চিঠিপত্র কলামের সাথে এর পার্থক্য হলো চিঠিপত্র পাঠকরা স্ব ইচ্ছায় লিখে থাকে। যার ফলে এতে পাঠকের স্বাধীন চিন্তার প্রকাশ থাকে। কিন্তু মুক্তচিন্তায় লেখা দেবার জন্য বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সংবাদপত্র উদ্যোগী হয়ে বিভিন্ন লেখকের লেখা সংগ্রহ করে। যার ফলে সংবাদপত্র সাধারণত যা চায় তাই প্রকাশ পায় এ ধরনের কলামে। তবে এ পাতাকে কখনই সম্পাদকীয় পাতার অংশ বলা যায় না।

প্রশ্ন ঃ সম্পাদকীয় পাতায় নীতিমালা প্রয়োগে সম্পাদক কতটুকু ভূমিকা পালন করেন? এতে পত্রিকার সুনাম ক্ষুণ্ন হয় কিনা?

সাখাওয়াত আলী খান ঃ নীতিমালা প্রয়োগে সম্পাদকের ভূমিকাই মূখ্য। তবে পুরো বিষয়টি নির্ভর করে সম্পাদকের ব্যক্তিত্বের ওপর। সম্পাদক যদি অভিজ্ঞ সাংবাদিক হন, তবে সংবাদপত্রের নীতিমালা প্রয়োগে তার ভূমিকা সংবাদপত্রের জন্য ইতিবাচক ভূমিকা বয়ে আনবে। কিন্তু মালিক যদি সম্পাদক হন বা মালিকের মনোনীত কেউ (যিনি অন্য পেশা থেকে এসেছেন) সম্পাদক হলে সংবাদপত্রের জন্য নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। দেখা যায় এ ধরনের মালিক সম্পাদকরা সংবাদপত্রের নীতিমালা প্রয়োগে তাদের ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করেন। ফলে পত্রিকার সুনাম স্বাভাবিকভাবেই ক্ষুণ্ন হয়।

প্রশ্ন ঃ সম্পাদকীয় নীতিমালা প্রয়োগে সম্পাদকীয় কাউন্সিল না সম্পাদক কার ভূমিকা বেশী গুরুত্বপূর্ণ?

সাখাওয়াত আলী খান ঃ সম্পাদকের ভূমিকাই বেশী গুরুত্বপূর্ণ। কারণ অনেক পত্রিকায় সম্পাদকীয় কাউন্সিল থাকেই না। আবার থাকলেও তা কতটুকু ভূমিকা নেবে তা নির্ভর করে ঐ সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় কাউন্সিলের গঠন প্রক্রিয়ার ওপর। যদি অভিজ্ঞ ও প্রবীন সাংবাদিকরা সম্পাদকীয় কাউন্সিলের সদস্য হন তবে সম্পাদকীয় নীতিমালা প্রয়োগে তাদের উপদেশ ও পরামর্শ সম্পাদক অনেকটাই গ্রহণ করতে পারেন। অসাংবাদিকরা

www.pathagar.com

যদি কাউন্সিলের সদস্য হন তবে তাদের ভূমিকা ততটা থাকে না। তবে সর্বোপরি সম্পাদকের ভূমিকাই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ঃ চিঠিপত্র কলামকে সম্পাদকীয় পাতা থেকে আলাদা করা উচিত কি?

সাখাওয়াত আলী খান ঃ চিঠিপত্র মূলত Feedback of Readers। কাজেই এর জন্য আলাদা পাতা হলে বিষয়টি মন্দ হয় না। আলাদা পাতায় গেলেও ঐ পাতাও সম্পাদকীয় পাতার অংশ হবে। চিঠিপত্র সম্পাদকীয় পাতার সাথে যাবে, না সম্পাদকীয় পাতার আরেকটি বাড়তি পাতায় তাকে আলাদা ট্রিটমেন্ট দেয়া হবে তা পুরোপুরি পত্রিকার পলিসির ওপর নির্ভর করে।

প্রশ্ন ঃ অন্য যে কোন পাতা থেকে সম্পাদকীয় পাতার গুরুত্ব আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করবেন?

সাখাওয়াত আলী খান ঃ তুলনা করা ঠিক নয়। প্রতিটি পাতারই ভিন্ন ভিন্ন মূল্যায়ন রয়েছে। প্রথম পাতার মূল বিষয় হলো সংবাদ। কাজেই সংবাদ এর গুরুত্বও কম নয়। আবার সম্পাদকীয় পাতার গুরুত্বও কোনো অংশে খাটো নয়। যেহেতু এতে পত্রিকার নীতিমালার প্রয়োগ থাকে, কাজেই এরও আলাদা গুরুত্ব রয়েছে।

প্রশ্ন ঃ সাংবাদিকতার শিক্ষক হিসাবে আমাদের দেশের সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় পাতাকে কতটুকু আদর্শ সম্পাদকীয় পাতা বলে আপনি মনে করেন?

সাখাওয়াত আলী খান ঃ আমাদের দেশের সংবাদপত্রসমূহের সম্পাদকীয় পাতাকে আদর্শ পাতা হিসেবে গড়ে তুলতে হলে উন্নয়নের অবকাশ রয়েছে। নতুন পরিস্থিতির সাথে, আধুনিকতার খাপ খাইয়ে নেবার জন্য বিষয়বস্তু এবং পৃষ্ঠাসজ্জা উভয় দিক থেকেই নতুনত্ব সৃষ্টির অবকাশ রয়েছে।

প্রশ্ন ঃ সম্পাদকীয় পাতাকে কিভাবে উন্নত করা যায়?

সাখাওয়াত আলী খান ঃ বিশেষভাবে বিচক্ষণ, দক্ষ এবং সিনিয়র সাংবাদিককে সার্বক্ষণিক এবং সুনির্দিষ্টভাবে শুধু সম্পাদক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হলে সম্পাদকীয় পাতার উন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে।

হাবিবুর রহমান মিলন

হাবিবুর রহমান মিলন দেশের একজন প্রথিতযশা সাংবাদিক। দীর্ঘদিন ধরে দৈনিক ইত্তেফাকে সহযোগী সম্পাদক হিসেবে কর্মরত। সম্পাদকীয় পাতার উপ-সম্পাদকীয় কলামে তিনি 'সন্ধানী' নামে লিখে থাকেন। তার লেখা বহু উপ-সম্পাদকীয় সত্তর, আশি ও নব্বই দশকের দিকে সমাজে যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছিল। তার যৌতুকের অভিশাপ কলামটি এতটাই প্রভাব ফেলে যে, একটি জাতীয় যৌতুক প্রতিরোধ কমিটি গঠিত হয় এবং পরবর্তীতে

www.pathagar.com

প্রণীত হয় যৌতুক বিরোধী আইন। সম্পাদকীয় পাতা ও এর বিষয়বস্তু নিয়ে তার অভিজ্ঞ আলোচনা থেকে সাংবাদিক সমাজ উপকৃত হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

প্রশ্ন ঃ সম্পাদকীয় ও উপ-সম্পাদকীয়-এর মধ্যে মূল পার্থক্য কী?

উত্তর ঃ প্রতিটি সংবাদপত্রেরই একটি নীতি থাকে। সম্পাদকীয় হচ্ছে সংবাদপত্রের সেই নীতি। এর ওপরে মাসট্ হেড দেয়া হয়। 'ইত্তেফাক' হলে 'ইত্তেফাক' এবং 'জনকণ্ঠ' হলে 'জনকণ্ঠ'। মাসট্ হেডের মানে এই যে, এখানে অর্থাৎ সম্পাদকীয় কলামে যা লেখা হয় এটি সংবাদপত্রের নীতি। একেক পত্রিকার নীতি একেক রকম হতে পারে। আর উপ-সম্পাদকীয় পত্রিকার নীতির সঙ্গে যুক্ত। তবে এক্ষেত্রে লেখকের স্বাধীনতা কিছুটা বেশি। মূলনীতির সঙ্গে সম্পর্ক রেখে অতীত এবং সমকালীন ঘটনার রেফারেন্স দিয়ে লেখা হয়। উপ-সম্পাদকীয় লেখার ক্ষেত্রে পুরান, ইতিহাস ও দেশ–বিদেশের ঘটনার উদ্বৃত্তি দিয়ে লেখা হয়। পত্রিকার মূল পলিসির বিপরীত না হলেই চলে। যেমন, গণতন্ত্র যদি কোনো পত্রিকার নীতি হয়, তাহলে সমাজতন্ত্রকে ওপরে স্থান দেয়া চলে না। সংশ্লিষ্ট পত্রিকার লীডার রাইটার বা সহযোগী সম্পাদকগণ সম্পাদকীয় ও উপ-সম্পাদকীয় লেখেন। তবে পত্রিকায় নিয়োজিত নয় এমন লেখকও উপ-সম্পাদকীয় লিখতে পারেন। উপ-সম্পাদকীয় বিশেষ শিরোনামে লেখা যায়। যেমন, 'ইত্তেফাক'। আবার স্বনামে শিরোনাম দিয়েও লেখা চলে। যেমন, 'জনকণ্ঠ' ও 'প্রথম আলো'।

প্রশ্ন ঃ সম্পাদকীয় পাতার অঙ্গসজ্জা/পৃষ্ঠাসজ্জায় কোনো সুনির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলা উচিত কি না?

উত্তর ঃ পাতার সৌন্দর্য পাঠকদের আকৃষ্ট করে বলেই মেক-আপে একটা ব্যাপার আছে। মেক-আপ দর্শনীয় হলেই হয়। এর বাঁধা-ধরা কোন নিয়ম নেই।

প্রশ্ন ঃ মতামত কলাম ও সিন্ডিকেট কলামের মধ্যে পার্থক্য আছে কি?

উত্তর ঃ যেকোন একটি কাগজে বিশেষ কোনো বিষয়ে ব্যক্তির চিন্তা-ভাবনা প্রকাশ করা 'মতামত'। সিন্ডিকেট কলাম একাধিক রকম হতে পারে। একই ব্যক্তির একই বিষয়ে লেখা (যেমন, গাফফার চৌধুরী) যদি একাধিক কাগজে প্রকাশিত হয় তাহলে একে সিন্ডিকেট কলাম বলা যেতে পারে। আবার তিন চারজন মিলে একটি বিষয়ে লেখাকেও বলা যেতে পারে। 'মতামত' এবং সিন্ডিকেট কলামে প্রভেদ এই যে 'মতামত' হচ্ছে একটি বিষয়ে একজন লেখকের লেখা একটি কাগজে ছাপা হওয়া। আর সিন্ডিকেট কলাম হচ্ছে এক ব্যক্তির একই লেখা একাধিক কাগজে ছাপা হওয়া বা তিন চার জন মিলে একটি বিষয় লেখা।

www.pathagar.com

প্রশ্ন ঃ উপ-সম্পাদকীয় এর একজন বিশেষজ্ঞ হিসেবে আপনার কি মনে হয় বর্তমানে উপ-সম্পাদকীয়-এর কোনো প্রয়োজন রয়েছে?

উত্তর ঃ উপ-সম্পাদকীয় লেখার প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়নি। ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ এবং উপমা, উদ্ধৃতি দিয়ে কোনো একটি বিষয় পাঠককে ভালভাবে বোঝানোর বা মটিভেট করার জন্য উপ-সম্পাদকীয় কলামের প্রয়োজন আছে।

প্রশ্ন ঃ সম্পাদকীয় পাতার মতো গুরুগম্ভীর স্থানে কার্টুনের ব্যবহার কতটা যুক্তিসঙ্গত?

উত্তর ঃ সম্পাদকীয় পাতার নিজস্ব একটি গাম্ভীর্য ও মর্যাদা আছে। সুতরাং কার্টুন ছাপা যথাসম্ভব পরিহার করা বাঞ্ছনীয়। তবে কালের সঙ্গে অনেক কিছুর পরিবর্তন হচ্ছে। সুতরাং কার্টুনও ছাপা যেতে পারে। তবে সে কার্টুন অবশ্যই সিরিয়াস ও গাম্ভীর্যপুর্ণ হতে হবে।

প্রশ্ন ঃ বর্তমানে কতগুলো পত্রিকায় মুক্তচিন্তা নামে একটি পাতা বের করা হয়। এ পাতাকে কি সম্পাদকীয় পাতার অংশ বলা যায়?

উত্তর ঃ মুক্তচিন্তা মানুষের স্বাধীন চিন্তার প্রতিফলন। সম্পাদকীয় ও উপ-সম্পাদীয় নিবন্ধে প্রত্যাশা বা পরোক্ষভাবে সংবাদপত্রের নীতি থাকে। কিন্তু মুক্তচিন্তা নিছক ব্যক্তি মানুষের অভিমত। সংবাদপত্রের নীতি এতে প্রতিফলিত নাও হতে পারে, এমন কি বিপরীতও হতে পারে।

প্রশ্ন ঃ সম্পাদকীয় পাতায় নীতিমালা প্রয়োগে সম্পাদক কতটুকু ভূমিকা পালন করেন? এতে পত্রিকার সুনাম ক্ষুণ্ন হয় কি না?

উত্তর ঃ সম্পাদকীয় নীতিমালা প্রয়োগে (প্রণয়নে নয়) সম্পাদকের দায়িত্ব গভীর। তিনিই প্রয়োগের ব্যাপারে দায়বদ্ধ। পত্রিকার নীতি যদি গণবিরোধী, কালের অনুপযোগী, প্রগতি বিরোধী এবং ইতিহাস বিকৃতির নামান্তর হয় তাহলে সুনাম খর্ব হতেই পারে।

প্রশ্ন ঃ সম্পাদকীয় নীতিমালা প্রয়োগে সম্পাদকীয় কাউন্সিল না সম্পাদকের ভূমিকা গুরুত্বপুর্ণ?

উত্তর ঃ নীতিমালা প্রয়োগে সময় সময় পরামর্শকের ভূমিকা ছাড়া সম্পাদকীয় কাউন্সিলের কোনো ভূমিকা নেই। বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কাউন্সিলের সভা ডেকে সম্পাদক আলোচনা করতে পারেন। তবে নীতি প্রয়োগে তার ভূমিকাই গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ঃ চিঠিপত্র কলামকে সম্পাদকীয় পাতা থেকে আলাদা করা উচিত কি?

উত্তর ঃ চিঠিপত্র কলাম সম্পাদকীয় পাতায় ছাপতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।

www.pathagar.com

সম্পাদকীয় পাতার বিপরীত পাতাতেও দেওয়া যেতে পারে। কর্তৃপক্ষ এবং পাঠকের নজরে সহজে আসার মতো হলেই চলে। তবে প্রথম বা শেষ পৃষ্ঠায় নয়।

প্রশ্ন ঃ আপনার অভিজ্ঞতায় আপনার কোনো একটি উপ-সম্পাদকীয় বা সম্পাদকীয় সমাজের ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলেছে, উল্লেখ করতে পারবেন কি? সেটা কিভাবে?

উত্তর ঃ সত্তর, আশি ও নব্বই দশকে লেখা বহু উপ-সম্পাদকীয় সমাজে প্রভাব ফেলে ছিল। সবগুলো বলা সম্ভব নয়। তবে যৌতুকের অভিশাপ, চরাঞ্চলে দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও উটের জকি হিসাবে শিশু পাচার প্রভৃতির কথা বলা যেতে পারে। যৌতুকের অভিশাপ ও চরাঞ্চলে দাঙ্গা-হাঙ্গামা ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলো। যৌতুকের অভিশাপ লেখাটির পর একটি জাতীয় যৌতুক প্রতিরোধ কমিটি গঠিত হয়। উক্ত কমিটির আন্দোলনের ফলেই প্রণীত হয় যৌতুক বিরোধী আইন। পক্ষান্তরে উটের জকি লেখাটি গণসচেতনতা ছড়ায় এবং কিছুটা প্রতিরোধ গড়ে তোলে। বাঙ্গালি সংস্কৃতির ওপর লেখাও প্রভাব সৃষ্টি করে। আমার উপ-সম্পাদকীয় লেখার সূত্র ধরেই সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে স্থাপিত হয় শিখা চিরন্তন।

প্রশ্ন ঃ অন্য যেকোন পাতা থেকে সম্পাদকীয় পাতার গুরুত্ব আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করবেন?

উত্তর ঃ অন্যান্য পাতায় দেশ-বিদেশের খবর, ফিচার, সাহিত্য ও শিক্ষা-সংস্কৃতি ইত্যাদি নানা বিষয়ে লেখা হয়। মূলত এগুলোর প্রতিক্রিয়া তাৎক্ষণিক। কিন্তু সম্পাদকীয় নিবন্ধের প্রতিক্রিয়া সুদূরপ্রসারী। তড়িৎ ফলাফল নাও পাওয়া যেতে পারে। তবে পাওয়ার সম্ভাবনা সহসা ফুরিয়ে যায় না। অন্যান্য পাতার মাধ্যমে জনগণকে তথ্য দেয়া হয় আর সম্পাদকীয় নিবন্ধে দেয়া হয় কার্যকারণসহ সমাধানের ইঙ্গিত। এখানেই এর গুরুত্ব সমধিক।

www.pathagar.com

সম্পাদকীয় লেখার কলাকৌশল

সম্পাদকীয় কোনো আইন বা ক্যালকুলেটিভ বিষয় না, যে কিছু নিয়ম অনুসরণ করলেই একজন সম্পাদকীয় লিখতে পারবে। তবে একটি সম্পাদকীয় তৈরি থেকে শেষ পর্যন্ত কতগুলো ধাপ অনুসরণ করা হয়। একজন অভিজ্ঞ সাংবাদিক খুব সচেতনভাবে এই ধাপ অনুসরণ করে না সত্য কিন্তু তার অজান্তেই তার লেখায় এই ধাপগুলো অনুসৃত হয়। তবে একজন নবীন সাংবাদিকের লেখার ক্ষেত্রে ধাপগুলো যথেষ্ট সহায়ক। ধাপগুলো হলো :

১। বিষয় নির্বাচন করা।
২। সম্পাদকীয়ের উদ্দেশ্য স্থির করা।
৩। পাঠক চিহ্নিত করা।
৪। সম্পাদকীয়ের বলার ভঙ্গী ঠিক করা।
৫। বিষয় নিয়ে গবেষণা করা।
৬। সাধারণ একটি কাঠামো গঠন করা।
৭। সম্পাদকীয়ের ভূমিকা লেখা।
৮। সম্পাদকীয়ের বডি লেখা।
৯। উপসংহার লেখা।

বিষয় নির্বাচন করা

সাধারণত একজন সম্পাদকীয় লেখক সকালেই পত্রিকা দেখে তার লেখার বিষয় নির্ধারণ করে ফেলেন। একটি দৈনিক পত্রিকায় স্থানীয়, জাতীয়, আন্তর্জাতিক, প্রভৃতি বহু ধরনের

www.pathagar.com

সংবাদ প্রচারিত হয়। এর মধ্যে থেকে একটি বিষয় বাছাই করে নেয়া খুবই কঠিন।

বিষয় নির্বাচন করার সময় লেখক নিজেকে কতগুলো প্রশ্ন করবে- আমি কি জনগণকে সুনির্দিষ্টভাবে বিষয়টি বোঝাতে পারবো? জনগণের অজানা যথেষ্ট তথ্য রয়েছে কি? এটি কি সময়োপযোগী? এটি জনগণের আলোচনার সঠিক সময়ে লেখা হচ্ছে কি?

উদাহরণস্বরূপ কোর্ট সংক্রান্ত কোনো একটি সম্পাদকীয় লেখার উদ্দেশ্য হলো- প্রথমত বিষয়টির প্রতি জনগণের আগ্রহ রয়েছে। সেজন্য নেয়া হয়েছে। বিষয়টি যে শুধুমাত্র কোর্টের বিষয় তা নয় বরং এটি জনগণ সংশ্লিষ্ট। পাঠকের আলোচনা কিংবা মতগঠনে সহায়তা করার জন্যে এটিকে সম্পাদকীয়ের একটি বিষয় হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে।

উদ্দেশ্য এবং পাঠক স্থির করা

লক্ষ করলে দেখা যাবে সম্পাদকীয়ের বিষয় নির্বাচনের সঙ্গে এর উদ্দেশ্য এবং কারা এর পাঠক তা আন্তঃসম্পর্কিত। একটি সম্পাদকীয়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে কিছু সুনির্দিষ্ট পাঠককে কোনো কিছু করতে কিংবা কোনো কিছু ভাবতে অনুপ্রাণিত করা। সম্পাদকীয়তে পাঠককে নির্দিষ্ট করে বলে দেয়া হয় না যে আপনি ওকেই ভোট দেবেন, বরং বলা হয় আপনি বিবেচনা করে দেখুন আপনার জন্য কে ভালো।

কখনও কখনও কোনো সম্পাদকীয়তে একজন ব্যক্তির পক্ষে জনগণকে প্রভাবিত করার চেষ্টা হয়। এ ধরনের লেখা লেখকের সংকীর্ণ মানসিকতার পরিচয় দেয়। এ ধরনের লেখার কারণে লেখক তার সাধারণ পাঠককে হারায়। তাই সম্পাদকীয় লেখার ক্ষেত্রে সজাগ থাকতে হয়।

একটি সম্পাদকীয় পাঠকের ওপর কতটা প্রভাব ফেলছে তার ওপর এর উদ্দেশ্যের সাফল্য আংশিকভাবে নির্ভর করে। অর্ধশতাব্দী আগেও বলা হতো যে সম্পাদকীয় পাঠকের ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলে।

গণযোগাযোগের সাম্প্রতিক তত্ত্বে বলা হয়েছে সাধারণ পাঠকদের উপর সম্পাদকীয় এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব রয়েছে। কোনো একটি নির্দিষ্ট সম্পাদকীয়ের মাধ্যমে এই প্রভাব পড়ে তা নয় বরং দিনের পর দিন একই বিষয় নিয়ে লেখা বিভিন্ন সম্পাদকীয়ের মাধ্যমে জনগণের সচেনতা বৃদ্ধি পায়। যার ফলে কোনো জনগোষ্ঠী তার এলাকায় সঠিক ব্যক্তিকে বাছাই করতে সক্ষম হয়। প্রকৃতপক্ষে সম্পাদকীয় যথেষ্ট তথ্য এবং যুক্তিতে পাঠককে প্রভাবিত করে থাকে।

"কোর্টের শুনানী সংক্রান্ত বিষয়ে একটি সম্পাদকীয় লেখার উদ্দেশ্যই হচ্ছে পাঠককে ইস্যুর গুরুত্ব বোঝানো। এর মাধ্যমে বাদী এবং বিবাদী উভয়পক্ষের উকিল, জাজ এবং

www.pathagar.com

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ কোনো মতামত যাচাই-বাছাই করতে পারবে। একই সাথে বিচার বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা সম্পাদকীয়ের যুক্তি-তর্কগুলো নিয়ে নতুনভাবে চিন্তা করতে পারবে। সাধারণ পাঠকের প্রতিক্রিয়াও তারা এই সম্পাদকীয়ের মাধ্যমে জানতে পারবে।

কাজেই সম্পাদকীয় একদিকে বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সুনির্দিষ্ট পাঠক অন্যদিকে সাধারণ পাঠক (যাদের ওপর বিষয়টি প্রভাব ফেলে) উভয়কে নিয়েই কাজ করে।

বলার ভঙ্গী নির্ধারণ

লেখার পূর্বে লেখক তার লেখনীর মাধ্যমে কিভাবে পাঠককে প্রভাবিত করবে সে বিষয়ে ভেবে নেয়। পাঠককে প্রভাবিত করতে হলে যথেষ্ট যুক্তি থাকতে হবে। সম্পাদকীয় লেখক তার সম্মকজ্ঞান, সদিচ্ছা এবং নীতিবোধ এর মাধ্যমে পাঠককে প্রভাবিত করতে পারেন। এরিষ্টোটল এর সময় শ্রোতাদেরকে যুক্তির মাধ্যমে প্রভাবিত করা হতো।

সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা যাচ্ছে যে, মানুষের অনুভূতি, মুল্যবোধ এবং সময়কে মাথায় রেখে তথ্য এবং যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে সম্পাদকীয় লেখা হয়। সম্পাদকীয় কখনও বিয়োগান্ত ঘটনায় সান্তণা দেয় কখনো সাহস যোগায় কখনও বা ভবিষ্যতের জন্য দিক-নির্দেশনা দেয়। যে উদ্দেশ্যেই লেখা হোক না কেন সম্পাদকীয় কোনো মতামতকে জোরালো ও সংঘবদ্ধ করতে পারে।

একসময় পত্রিকায় মানুষ নিজে এসে তার আবেগ মতামত ব্যক্ত করতো। বর্তমানে এ ধরনের আবেগকে গুরুত্ব দেয়া হয় না। আজকের সম্পাদকীয় লেখকরা পাঠকের মতামতকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। আজকের পাঠক গত দশকের পাঠকের চাইতে অনেক বেশি শিক্ষিত এবং তথ্য সমৃদ্ধ। ফলে সহজে একটি সংবাদের সত্যতা এবং তাতে যথেষ্ট তথ্য রয়েছে কিনা তা যাচাই করতে পারে।

বিষয় নিয়ে গবেষণা করা

একটি সম্পাদকীয় কেমন হবে তার ওপর নির্ভর করে এর জন্যে কেমন গবেষণা করতে হবে। সম্পাদকীয় লেখার জন্যে খুব কম লেখকই প্রতিদিন লাইব্রেরীতে যেতে পারেন। কোনো বিষয়কে একটি দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে গবেষণার সুযোগ থাকে কম।

কোনো ঘটনা সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করলে সেই ঘটনার পেছনের ঘটনার ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে হবে। ঘটনার পেছনের ঘটনা খুজে বের করার জন্য গবেষণার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

সাধারণ একটি কাঠমো তৈরি করা

সম্পাদকীয় এর বিষয় নির্ধারণের পর লেখক যুক্তির মাধ্যমে বিষয়টিকে পাঠকের কাছে তুলে ধরেন। এটি করতে গিয়ে তিনি কখনো একপেশেভাবে যুক্তি খণ্ডণ করেন, আবার

www.pathagar.com

কখনো কখনো বিভিন্ন ধরনের যুক্তিতর্কের মাধ্যমে বিষয়টি উপস্থাপন করেন।

পাঠক ভেদে লেখক তার যুক্তি তুলে ধরেন। কম শিক্ষিত পাঠকদের ক্ষেত্রে একপেশে যুক্তি অনেক প্রভাব বিস্তার করতে পারে। যে সমস্ত বিষয় মানুষ কম জানে, বিতর্কিত নয়, সেগুলোর জন্যে একপেশে যুক্তি যথেষ্ট কার্যকরী হয়।

সম্পাদকীয়তে যুক্তির খন্ডন থাকে উচ্চশিক্ষিত লোকের জন্যে । শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান পাঠক একটি ঘটনাকে বিভিন্ন দিক থেকে বিচার-বিশ্লেষণ করে। তারা ঘটনার সবদিক যুক্তির সাহায্যে জানতে চায়। লেখক উদ্দেশ্যের সাথে সংগতি রেখে যুক্তির মাধ্যমে বিতর্কিত বিষয়গুলো বের করে আনেন। কোনো বিষয়ের সমাধান দেখাতে হলে প্রথমে সমস্যা বা প্রয়োজনগুলো তুলে ধরে পরে এর সমাধান দিতে হয়। গবেষকদের মত হলো দুর্বল যুক্তিগুলো লেখার মাঝখানে দিতে হয়। পাঠককে জোর করে কোনো বিষয় চাপিয়ে দেয়া হলে সে কখনই তা গ্রহণ করবে না। পাঠক তার বিশ্বাসের সঙ্গে প্রথমে সম্পাদকীয়তে দেয়া তথ্য ও যুক্তিকে যাচাই করে তারপর সে তা গ্রহণ করে। সাধারণত মতের কাছাকাছি কোনো অভিমতকে পাঠক গ্রহণ করতে পছন্দ করে।

একটি সৎ সম্পাদকীয় কখনই অস্বাভাবিক কোনো পরিবর্তন আনতে পারেনা। বরং এর মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি করা যায়। লেখকের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা থাকতে হবে। কোনো বিষয়কে এমনভাবে উপস্থাপন করতে হবে যাতে পাঠক স্বপক্ষ এবং বিপক্ষ উভয় যুক্তির মাধ্যমে ঘটনাটির সত্যতা যাচাই করতে পারে।

সম্পাদকীয়ের সূচনা বা শুরু

সূচনা ও সমাপ্তি সম্পাদকীয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুটি অংশ। সম্পাদকীয়ের সূচনা যথেষ্ট আকর্ষণীয় হওয়া উচিত। যাতে পাঠক পড়তে আগ্রহী হয়। একটি আকর্ষণহীন সূচনা পাঠকের পড়ার আগ্রহ অনেকটাই নষ্ট করে দেয়। অন্যদিকে লেখককে জানতে হবে পাঠক শেষে কি জানতে চাচ্ছে। ঘটনার পরিসমাপ্তি যদি শুরুতে আনা যায় তাহলে অনেক বেশি পাঠককে প্রভাবিত করা সম্ভব।

অধিকাংশ সময়ে সম্পাদকীয়ের শুরুতে লেখক একটি প্রস্তাবের সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দেন, তারপর ঘটনা অথবা পরিস্থিতির বর্ণনা দিয়ে লেখনী শুরু করেন। সংবাদ আকারে পত্রিকায় যা এসেছে সম্পাদকীয়ের শুরুতে পুণরায় সে তথ্যের সহজ উপস্থাপন হতে পারে। যারা বিষয় সম্পর্কে ততটা অবগত নয় তাদের জন্যে এই প্রক্রিয়াটি প্রযোজ্য।

কখনো কখনো কোনো ঘটনার বিবৃতির চাইতে সার্বিক পরিস্থিতি তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়। এক্ষেত্রে শুরুতে ঘটনার পটভূমি তুলে ধরে পাঠককে বোঝাতে চেষ্টা করা হয় যে

www.pathagar.com

ঘটনাটি একটি তাৎক্ষণিক বিষয়। এছাড়াও লেখনীর মাধ্যমে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি পাঠকের কাছে আরও গুরুত্বপূর্ণ করে তুলতে পারে।

লেখার শুরুতে যে সব যুক্তি দেখানো হয় সেগুলো বিশ্বাসযোগ্য হতে হবে। "হ্যাঁ" বাচক, "কিন্তু" শব্দ ব্যবহার তখনই কার্যকরী হয় যখন একটি পত্রিকা কোনো একটি ইস্যুতে পরিবর্তন ঘটাতে চায়।

কখনও-কখনও কোনও সম্পাদকীয় একটি প্রশ্ন দিয়ে শুরু হতে পারে। যা পুরো ঘটনার ইঙ্গিত করবে। ফলে পাঠক তার প্রশ্নের উত্তর পাবার জন্য সম্পাদকীয়টি পড়তে কৌতূহলী হবে। প্রশ্ন হতে হবে সত্যি, যুক্তিযুক্ত, শব্দের কথামালা নয়।

সম্পাদকীয়ের শুরু নাটকীয় হতে পারে। কোনো শুষ্ক রূঢ়, জটিল বিষয়ের ক্ষেত্রে নাটকীয় শুরু কার্যকরী। সম্পাদকীয়তে যুক্তি অত্যন্ত কার্যকরী একটি উপাদান।

সম্পাদকীয়ের অবয়ব

একজন অভিজ্ঞ সম্পাদকীয় লেখক কয়েক মুহূর্তের মধ্যে তার লেখার বিষয়, পাঠক, উদ্দেশ্য, বলার ভঙ্গী এসব বিষয় নিয়ে সাধারণ একটি পদ্ধতি তৈরি করে ফেলেন। তিনি এই কাজটি অসচেতনভাবে করে থাকেন। দীর্ঘদিন সম্পাদকীয় লেখার ফলে অভিজ্ঞ লেখক সম্পাদকীয় লেখার একটি নির্দিষ্ট ও সঠিক ধরন খুঁজে পান।

সম্পাদকীয়ের শুরুটা হবে আগ্রহ উদ্দীপক। একে অনুসরণ করে যুক্তি-তর্ক, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে পুরো সম্পাদকীয় সাজানো হয়। একজন সম্পাদকীয় লেখক যদি পত্রিকার নীতি এবং বিবেকের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে একটি লেখায় সমস্ত তথ্য এবং নিরপেক্ষ যুক্তি দিতে পারেন তাহলে পাঠক ঐ সম্পাদকীয় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবেই। ফলে সম্পাদকীয় হচ্ছে- পরিস্থিতির বিবৃতি, পটভূমি, এক পক্ষের যুক্তি, অন্যপক্ষের যুক্তি, যুক্তির পক্ষে আলোচনা এবং উপসংহার সম্বলিত রচনা। একটি সফল সম্পাদকীয়তে থাকবে, পরিস্থিতির উপস্থাপন, বিরোধী মতামত, যুক্তির আলোচনা এবং সুন্দর সমাপ্তি।

যে সব পাঠক বিষয়টি ভালো জানেন না এবং পরবর্তী তর্ক-বিতর্কে যাবার প্রয়োজন বোধ করেন না, যুক্তির ওপর ভর করে বিশ্বাস করেন, তাদের জন্যে একপেশে সম্পাদকীয় কার্যকরী। এই ধরনের সম্পাদকীয় শুরু হয় একটি বিবৃতি দিয়ে এবং এরপর একপেশে যুক্তি উপস্থাপন এবং ঐ যুক্তির ভিত্তিতে একটি পরিসমাপ্তিতে পৌঁছানোর মধ্যদিয়ে সম্পাদকীয় লেখনীর সমাপ্তি ঘটে। তবে যারা বিভিন্ন মতে বিশ্বাসী এবং যারা বিষয়টি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেন তাদের জন্যে এ ধরনের সম্পাদকীয় খুবই বিপদজনক।

www.pathagar.com

সম্পাদকীয় যদি শেষ অংশ দিয়ে শুরু হয় তবে তা হয় একটি শক্তিশালী উপস্থাপনা। বেশিরভাগ সম্পাদকীয় লেখক এ ধরনের সম্পাদকীয় পছন্দ করেন। এই ধরনের সম্পাদকীয়তে উপসংহার, পরিস্থিতির সংক্ষিপ্ত বিবৃতি, অতিরিক্ত তথ্য, উপসংহারের পক্ষে যুক্তি, পরিশেষে সমাপ্তি টানা এ বিষয়গুলো থাকে।

দিক-নির্দেশনা

একটি তথ্যসমৃদ্ধ গঠনমূলক শুরু যেমন পাঠককে আকৃষ্ট করে, ঠিক তেমনি একটি নির্দেশনামূলক সমাপ্তি পাঠককে প্রভাবিত করে। একটি সম্পাদকীয়ের উদ্দেশ্যের ওপর এর সমাধান নির্ভর করবে এবং এর মাধ্যমে লেখক কী প্রকাশ করতে চায় তা বোঝা যাবে। সম্পাদকীয় উপসংহার ৬টি ভিন্ন ভিন্ন কাঠামোয় লেখা যেতে পারে।

এই ৬টি ধরন হচ্ছে

১। জোরালো সুপারিশ বা গুরুত্বারোপ করা।
২। অনুমোদন করা।
৩। অননুমোদন করা।
৪। সঠিকভাবে শেষ করা।
৫। সমাধান করা।
৬। সহজভাবে শেষ করা।

সম্পাদকীয় লেখক তার রচনার শেষাংশে সুনির্দিষ্ট এবং সরাসরিভাবে জোরালো সুপারিশ দিতে পারে। লেখক তার লেখার সমাপণীতে সক্রিয় হবার উপদেশ দিতে পারে, জোরেসোরে প্রভাবিত করতে পারে, সম্ভাব্যতা নির্দেশ করতে পারে, কোনো দায়িত্ব সম্পর্কে সজাগ করে তোলার জন্য পাঠককে প্রভাবিত করতে পারে। সম্পাদকীয়তে আমরা "করব" শব্দ ব্যবহার করার চাইতে "করা উচিত" বলা শ্রেয়। তেমনি "আমরা আশা করি"র চাইতে "আমরা আশা করতে পারি" অনেক বেশি কোমল।

কখনো কখনো সম্পাদকীয় লেখক কোনো কিছু অনুমোদনের জন্যে কিংবা কোনো পরিবর্তন ঘটানোর জন্যে প্রস্তাব দিতে পারে। লেখার শেষভাগে ইতিবাচক ইঙ্গিত থাকা উচিত। এই ইতিবাচক উপসংহারে নির্দেশনামূলক বক্তব্য কোনো কাজের জন্যে গর্ববোধ করা। ইতিবাচক ঘোষণা, ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতার কথা বলা, দীর্ঘমেয়াদী প্রভাবের উল্লেখ এমনি বিভিন্নভাবে পরিসমাপ্তি টানা যেতে পারে।

অনেকক্ষেত্রেই সম্পাদকীয়তে অনুমোদিত বিষয়ের পরিবর্তে অননুমোদিত বিষয়ের ওপর

www.pathagar.com

গুরুত্ব দেয়া। অননুমোদিত সম্পাদকীয়ের চেয়ে অননুমোদিত সম্পাদকীয়ের সংখ্যা কম এবং এটি বিভিন্নভাবে লেখা যেতে পারে। (১) আমরা একটি ব্যাপারে কতটকু বিশ্বাস করতে পারি, (২) একটি নিয়ন্ত্রিত কিন্তু অননুমোদনের চিরন্তন বিবৃতি, (৩) কোনো কিছু সঠিকভাবে হচ্ছে না এ ব্যাপারে শক্তিশালী নিরপেক্ষ প্রস্তাব, (৪) সঠিক পথনির্দেশ না দেয়া। এ ধরনের লেখার ক্ষেত্রে লেখকের সৎ উদ্দেশ্য থাকতে হবে।

সঠিকভাবে শেষ করা। কোনো সম্পাদকীয় পাতার উদ্দেশ্য থাকে জনগণকে সচেতন করে তোলা, সঠিক পথ নির্দেশ করা। সম্পাদকীয় লেখক যদি যথাযথ সময়ে বিষয়টি তুলে ধরতে পারে তাহলে সম্পাদকীয়ের ছোট-খাট প্রচার সম্পর্কে কারোরই কোনো অভিযোগ থাকা উচিত নয়। সম্পাদকীয়তে বিষয়কে সঠিকভাবে তুলে ধরতে হবে।

বেশিরভাগ সম্পাদকীয় লেখক কোনো রকম পরিসমাপ্তি না দিয়ে তত্ত্ব ও তথ্যের সমাহারে বিষয়টি তুলে ধরে। কিন্তু সম্পাদকীয় লেখনীর সুন্দর পরিসমাপ্তির জন্যে শেষ অংশটুকু সহজ ও সাবলীল হতে হবে।

উপসংহার

উপরে উল্লেখ করা বিষয়গুলো যেভাবে সাজানো হয়েছে সম্পাদকীয় লেখার ক্ষেত্রে সচেতনভাবে কেউ তা অনুসরণ করে না। তবে এগুলো বলে দেবে সম্পাদকীয় শুরু থেকে শেষাবধি কিভাবে সাজানো হবে। দীর্ঘদিন লিখতে লিখতে সম্পাদকীয়ের একটি কাঠামো দাঁড়িয়ে যায় সত্যি, কিন্তু একজন নবীন লেখকের জন্যে ধাপগুলো অনেক বেশি সহায়ক হয়।

ভালো লেখার নয়টি ধাপ

জেমস জে কিলপ্যাট্রিক (James J. Kilpatrick) বলেছেন, "ভালো লেখা বলতে আমি বুঝি প্রথমত সহজবোধ্য লেখা, দ্বিতীয়ত সহজবোধ্য লেখা এবং তৃতীয়ত সহজবোধ্য লেখা। সম্পাদকীয়ের শব্দ হওয়া উচিত মচমচে, ছন্দময়। যা পাঠক সহজে লুফে নেবে"।

একটি বিশ্বাসযোগ্য ও সহজে গ্রহণীয় সম্পাদকীয় লেখার জন্য কতগুলো মৌলিক ধাপ রয়েছে। ধাপগুলো হলো :

১। পর্যাপ্ত ঘটনার সমারোহ।

২। যুক্তিযুক্ত সমাধান।

৩। বিষয় সংশ্লিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী।

www.pathagar.com

৪। সঠিক সূত্র এবং পূর্ববর্তী ঘটনার উল্লেখ।

৫। সঠিক বাক্য গঠন করা।

৬। শব্দের উপযুক্ত ব্যবহার।

৭। সঠিক ব্যকরণে লেখা।

৮। গতানুগতিক এবং পরিভাষিত কথাবার্তা ব্যবহার না করা।

৯। ব্যক্তিগত শব্দের সঠিক প্রয়োগ।

সম্পাদকীয়তে একটি বিষয়ের ওপর লিখতে গিয়ে বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঘটনাসমূহ উল্লেখ করা প্রয়োজন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে লেখক যে বিষয়ের উপর লিখতে যায়, সে বিষয় সংক্রান্ত সংবাদ আগেই পড়ে ফেলে। তাই সে ঘটনার পুনরাবৃত্তি চায় না। তবে লেখকের অনেক সময় বহু তথ্যই জানা থাকেনা যা উল্লেখ করতে হবে। সম্পাদকীয় লেখার জায়গা সীমিত। তাই কোনো সম্পাদকীয় লিখতে হলে যথার্থ, সঠিক ও প্রয়োজনীয় ঘটনা ও শব্দের ব্যবহার করতে হবে।

সম্পাদকীয়তে মৌলিক কতগুলো প্রশ্ন তুলে দিয়ে এর সমাধান দেখাতে হবে। যুক্তির মাধ্যমে সমাধান দিতে হবে। বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে লেখকের প্রজ্ঞা, জ্ঞান ও দূরদৃষ্টির ওপর নির্ভর করে। পত্রিকার নীতির প্রতি শ্রদ্ধা রেখে বিষয়টিকে তুলে ধরতে হবে।

সঠিক সূত্র এবং পূর্ববর্তী ঘটনার উল্লেখ থাকতে হবে। শব্দের পুনরাবৃত্তি একটি বিরক্তিকর প্রক্রিয়া। শব্দ, উক্তি, বাক্য এমনকি অনুচ্ছেদের পুনরাবৃত্তি করা ঠিক নয়।

কখনও-কখনও বলা হয় সংবাদের চাইতে সম্পাদকীয়ের বাক্যের দৈর্ঘ্য বেশি হয় যা বোঝা কঠিন। তবে গবেষণায় দেখা গেছে সম্পাদকীয় বোঝা সহজ। কেননা এ ধরনের লেখকদের লেখার অভিজ্ঞতা সংবাদ লেখকদের চাইতে বেশি। একজন রিপোর্টার রিপোর্ট তৈরি এবং ঘটনার তদন্তে দক্ষ হতে পারেন কিন্তু তাকে কাজ করতে হয় দ্রুত, একটি সীমাবদ্ধ সময়ের মধ্যে। কিন্তু একজন সম্পাদকীয় লেখক যাচাই-বাছাই করার সময় পায় বেশি। বার বার লিখে তথ্যকে সুগঠিত করতে পারে।

সম্পাদকীয় লেখার ভাষা সহজ হতে হবে। ছোট ছোট বাক্য গঠন করতে হবে। সম্পাদকীয় লেখককে শব্দ ব্যবহারে মিতব্যায়ী এবং সংযমী হতে হবে। ছোট ছোট শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করতে হবে। সম্পাদকীয় লেখক ব্যাকরণ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা রাখবে। সম্পাদকীয়তে গতানুগতিক এবং পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করা যাবে না।

www.pathagar.com

সম্পাদকীয় পাতার লোকবল

সম্পাদকীয় পাতার লোকবল কত হবে এ ব্যাপারে নির্দিষ্ট সীমারেখা নেই। পত্রিকার প্রকৃতি এবং আকার অনুযায়ী এর লোকসংখ্যা ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। তবে আমাদের দেশের বেশিরভাগ পত্রিকাগুলোর সম্পাদকীয়পাতায় অল্প লোক এবং খন্ডকালীন ব্যক্তি দিয়ে চালিয়ে দেয়া হয়। সাধারণত সম্পাদকীয় পাতা এক ব্যক্তি নির্ভর, দ্বিব্যক্তি নির্ভর কিংবা তিনব্যক্তি নির্ভর হয়ে থাকে।

একব্যক্তি নির্ভর সম্পাদকীয় পাতার ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তিই ঐ পাতার সব কিছু করে। কলাম লেখা, কার্টুন, চিঠিপত্র দেখা এবং সর্বোপরি সমস্ত বিষয়গুলো দিয়ে পৃষ্ঠাসজ্জাও তিনি করেন। এক্ষেত্রে সুবিধা এবং অসুবিধা দুই-ই রয়েছে। এর ফলে প্রশংসা যেমন একজন ব্যক্তিই কুড়ান ঠিক তেমনিভাবে দুর্নাম বা সমস্যা দেখা দিলে একজনকেই সামাল দিতে হয়। একই ব্যক্তি সমস্ত পাতার দায়িত্বে থাকার কারণে প্রতিটি বিষয়ের কোনটিতেই বিশেষ মনোযোগ দিতে পারেন না। এক ব্যক্তি নির্ভর সম্পাদকীয় পাতার এটি একটি দুর্বলতা।

যদি একজন ব্যক্তি যথেষ্ট না হয় তবে কতজন ব্যক্তি সম্পাদকীয় পাতায় কাজ করবে এ ব্যাপারে ভিন্ন মত রয়েছে। বলা হয়ে থাকে যে, পত্রিকার প্রচার সংখ্যার সাথে সম্পাদকীয় পাতার লোক সংখ্যা কমবেশি হওয়া নির্ভর করে। গবেষণায় বলা হয়েছে- একটি পত্রিকার প্রচার সংখ্যা এক লাখ হলে ৩ জন full-time writer থাকা উচিত, ২ লাখ হলে ৪ জন এবং ৫০ হাজার থেকে ১ লাখ হলে ২ জন লেখক থাকা উচিত।

তবে, একটি সম্পাদকীয় পাতার মান ভালো করতে কতজন লোক প্রয়োজন তা সব সময় প্রচার সংখ্যার ওপর নির্ভর করে না। একটি ছোট পত্রিকা তার পত্রিকার মানোন্নয়নের জন্যে বেশি লেখক রাখতেও পারে। যেহেতু বড় পত্রিকাগুলোর প্রচার বেশি বিজ্ঞাপন বেশি পায় এবং খরচ ও বেশি করতে পারে, সেক্ষেত্রে সম্পাদকীয় পাতার মানোন্নয়ন করা তাদের পক্ষে সহজতর হয়।

একটি সম্পাদকীয় পাতায় এক জনের চেয়ে বেশি লোক থাকলে ব্যক্তি বিশেষের মধ্যে কাজ ভাগ করে দেয়া যায়।

এক ব্যক্তি নির্ভর পাতার ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তির ওপর সব কাজের দায়িত্ব দেয়া থাকে। তবে চিঠির ঠিকানা লেখা, চিঠির শিরোনাম দেয়া এ কাজগুলো সাধারণত সংবাদকক্ষে কাজ করে এমন কোনো ব্যক্তি দেখে থাকে।

www.pathagar.com

দ্বিব্যক্তিক পাতার ক্ষেত্রে একজন চিঠিপত্র, কলাম এবং কার্টুন দেখে থাকেন। সম্পাদকীয় পাতার দায়িত্বে যিনি থাকেন তিনি সম্পাদকীয় লেখক, পাঠক এবং সংবাদপত্র ব্যবস্থাপনার সাথে সরাসরি কথা বলেন। যিনি চিঠিপত্র এবং কলাম লিখেন তিনি সময় পেলে সম্পাদকীয়ও লিখে থাকেন।

Three-Person-staff-এর ক্ষেত্রে পাতার সম্পাদক একজনকে চিঠিপত্র দেখার, অন্যজনকে কলাম এবং আরেকজনকে পৃষ্ঠাসজ্জার দায়িত্ব দিতে পারেন। যদি সম্পাদকীয় পাতায় সাপ্তাহিক মতামত নেয়ার কোনো ব্যবস্থা থাকে তাহলে কোনো একজনের ওপর এর দায়িত্ব দেয়া হয়।

যেসব পত্রিকায় চিঠি এবং কলাম লেখার জন্যে বেশি লোকের প্রয়োজন হয় সেই পত্রিকার ক্ষেত্রে ঐ পাতার জন্যে সার্বক্ষণিকভাবে লোক নিয়োগ করা হয়। সার্বক্ষণিকভাবে নিয়োজিত স্টাফ চিঠিপত্র ও কলামের কপি সম্পাদনাও করে থাকেন।

জটিল দিন

সম্পাদকীয় লেখকের কাছে জটিল দিন বলে কোনো কথা নেই। একজন সম্পাদকীয় লেখকের সাথে বহিঃর্বিশ্বের যোগাযোগ ভালো থাকে। ফলে তার কাছে জটিল দিন বলে কিছু নেই। প্রত্যেকটি বিষয় সম্পর্কে তিনি জ্ঞান রাখেন এবং ক্রমাগত জানার চেষ্টা করেন। প্রত্যেক জায়গায় তার সূত্র রাখেন। এমনকি সময়, সুযোগ এবং প্রয়োজন বুঝে লেখার বিষয়ের জন্য লাইব্রেরীর স্মরণাপন্ন হন।

সম্পাদকীয় মিটিং

প্রতিদিনকার সম্পাদকীয় বোর্ড এর মিটিং-এ সম্পাদক এবং সম্পাদকীয় লেখকরা মূল্যবোধ এবং মূল্যবোধের স্খলন নিয়ে আলোচনা করেন। সভায় বিভিন্ন ইস্যুর ওপর ভিত্তি করে আলোচনা হয়। যার মধ্য থেকে পাঠকের চাহিদা এবং নতুন নতুন ধারণা বেরিয়ে আসে। এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে কোন বিষয়ের উপর কতটা গবেষণা করা প্রয়োজন তা নির্ধারণ করা হয়। কোনো একটি সম্পাদকীয় যদি একের অধিক ব্যক্তির মতামতকে উপস্থাপন করে তাহলে সম্পাদকীয়তে তার একটি মিশ্র প্রতিক্রিয়ার প্রতিফলন ঘটানো হয়।

সম্পাদকীয় পাতার লেখকদের প্রতিদিন ভোরবেলা পাতার সম্পাদকদের সাথে ঐ দিনের বিষয় নিয়ে আলোচনা করা উচিত। সম্পাদকীয় পাতার সম্পাদক পত্রিকার সম্পাদক এবং প্রাপকের সাথে পত্রিকার নীতি নিয়ে আলোচনা করেন।

www.pathagar.com

কখনও যদি কোনো বিষয়ে assignment দেয়া হয়ে থাকে কিন্তু মিটিংএ তা বিশেষভাবে আলোচনা না করেই। তবে সেক্ষেত্রে বিষয়টি সম্পর্কে সতর্ক হয়ে কাজ করতে হবে।

দেখা যায় এ সকল বোর্ড মিটিং এ জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ইস্যু নিয়ে আলোচনা হয়। স্থানীয় বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দেয়া হয় কম। বড় পত্রিকাগুলোর ক্ষেত্রে অনেক পাঠককে ধরে রাখার জন্যে স্থানীয় বিষয়গুলোও বোর্ড মিটিং-এর আলোচনায় তোলা উচিত।

সম্পাদকীয় পাতার লোকবল কেমন হবে এ বিষয়ে বিশেষ কোনো আদর্শ নির্ধারিত হয়নি। প্রতিটি পত্রিকার অভিজ্ঞতা ও সার্কুলেশনের ভিত্তিতে এর লোকবল হয়ে থাকে। এক ব্যক্তি পাতা কিংবা দ্বিব্যক্তি পাতা যে কোন পাতার ক্ষেত্রে প্রচার সংখ্যার ওপর পাতার লোক সংখ্যা নির্ধারিত হয় না। পত্রিকার প্রচারের সাথে সম্পাদকীয় পাতার চাহিদার সম্পর্ক কম। প্রচার যা-ই হোক না কেন সম্পাদকীয় পাতা বের হবেই, কলাম, চিঠি ছাপা হবেই। নির্দিষ্ট সংখ্যক সম্পাদকীয় বের হবেই এবং পাঠকের সাথে দেখা করতে হবে।

এসব কাজগুলো ছোট/বড় সব পত্রিকার জন্যে প্রযোজ্য। তবে লোকবল বেশি হলে সুসংগঠিতভাবে পাতাটি বের করানো যায়। যদি একজন লেখক কোনো একটি কিংবা দুটি বিষয়ের ওপর মনোযোগ দিতে পারেন তা হলে তিনি একজন ভালো সম্পাদকীয় লেখক হতে পারবেন। একজন সম্পাদকীয় লেখক একদিকে যেমন কোনো বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হবেন ঠিক তেমনিভাবে তিনি কোনো বিষয়ের সাধারণীকরণও করবেন।

সম্পাদকীয় লেখক নিজেকে কিভাবে তৈরি করবেন

সম্পাদকীয় লেখক হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলার প্রস্তুতি অনেকটা নিজের জীবন গড়ে তোলার মতো। সম্পাদকীয় লেখকের প্রখর চিন্তাশক্তি, বুদ্ধিমত্তা, অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞানস্পৃহা থাকা প্রয়োজন। সম্পাদকীয় লেখক হবেন একজন আদর্শবান ব্যক্তি।

একাডেমিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিনিয়ত প্রতিটি ঘটনা, পরিস্থিতি থেকে শিক্ষা নেয়ার মানসিকতা থাকতে হবে। পড়ার অভ্যাস থাকতে হবে। নিজস্ব সংস্কৃতিতে নিজেকে সমৃদ্ধ করে তুলতে হবে।

প্রতিনিয়ত পৃথিবী বদলে যাচ্ছে। ফলে এর ভূ-প্রকৃতি, বিজ্ঞান, পরিসংখ্যান, কৃষি, রাজনীতি অর্থাৎ প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটছে। এই পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে একজন সম্পাদকীয় লেখককে এগিয়ে যেতে হয়। সম্পাদকীয় লেখকের শিক্ষার পরিধি চলমান। এর কোনো শেষ নেই।

যে সব সম্পাদকীয় লেখক পরিবর্তিত বিশ্বকে পাঠক সমাজের কাছে তুলে ধরতে চায় তাদেরকে ঘর থেকে বের হতে হবে।

www.pathagar.com

একটি পত্রিকার অন্য যে কোন পাতার অন্য যে কোন সাংবাদিকের চাইতে একজন সম্পাদকীয় লেখকই শুধুমাত্র তার পুরো কর্মময় জীবনে তাবৎ বিশ্বে কি ঘটছে তা জানার চেষ্টা করে। সম্পাদকীয় লেখা হবে একটি "সুগন্ধী বাক্সের" মতো যা গন্ধ ছড়ায়। যার মাধ্যমে খুব দ্রুত একটি বিষয়ের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

মজার ব্যাপার হচ্ছে রিপোর্টারদের মতোই সম্পাদকীয় লেখার সাথে লেখকের নাম থাকা বা না থাকার চেয়ে তাদের লেখা মতামত গঠনে অনেক বেশি গুরুত্ববহ।

সম্পাদকীয় লেখকের মধ্যে কিছু গুণ থাকতে হবে। যেমন–

১। বিভিন্ন বিষয়ের ওপর ব্যাপক জানার আকাঙ্ক্ষা থাকতে হবে।

২। অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হতে হবে।

৩। সুক্ষ্ম অর্ন্তদৃষ্টি ও দুরদৃষ্টি থাকতে হবে।

৪। নিরপেক্ষ বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষমতা থাকতে হবে।

৫। লেখক নীতির ওপর বলিষ্ঠ থাকবেন।

৬। অভিমত প্রকাশের ইচ্ছা থাকতে হবে।

৭। জোরালো যুক্তি প্রদর্শনের জন্যে নিজের মধ্যে তথ্যের ভান্ডার থাকতে হবে।

৮। গবেষণার জন্যে অনুসন্ধিৎসু মন থাকতে হবে।

৯। ভালো রিপোর্টার হতে হবে।

১০। বাস্তবতা বুঝতে হবে।

১১। সম্পাদকীয় লেখক ভালো সমালোচক হবেন।

১২। মানবীয় গুণের অধিকারী হবেন।

১৩। সত্য তুলে ধরার সাহস থাকতে হবে।

১৪। সর্বোপরি লেখার ভালো হাত থাকতে হবে।

www.pathagar.com

সম্পাদকীয় লেখনীর তথ্য উৎস

সম্পাদকীয় লেখনীর ক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বিষয় গবেষণা। সম্পাদকীয় লেখক কোনো বিষয়ে লেখার আগে সে বিষয় নিয়ে চিন্তা করেন, পড়াশুনা করেন। পরবর্তীতে তিনি তার চিন্তা এবং জ্ঞানকে একত্রিত করে ঐ বিষয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করেন। বলা হয়ে থাকে যে, কোনো সম্পাদকীয় লেখার জন্যে ঘটনা এবং তথ্য নিয়ে অধিক গবেষণার সম্পাদকীয় লেখনী অতিরিক্ত জটিল ও কাঠখোট্টা হয়ে পড়ে। কিন্তু সঠিকভাবে গবেষণা করলে তা হয়ে দাঁড়ায় একজন সম্পাদকীয় লেখকের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের ভান্ডার।

গণমাধ্যম কর্মী বিশেষত সম্পাদকীয় লেখকদের প্রতিনিয়ত তথ্য সংগ্রহ ও তা সংরক্ষণ করে যেতে হয়। তথ্য সংগ্রহের জন্যে সংবাদকর্মী বা সাংবাদিকরা সাধারণত স্পটে যান, যাতে করে সংবাদটি সঠিক ও বিশ্বাসযোগ্য হয়। স্পটে যাওয়া ছাড়াও সাংবাদিকরা এ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। তথ্যকে বিশ্বাসযোগ্যভাবে উপস্থাপনের জন্যে তারা পুলিশের কাছে যান, হাসপাতালে খোঁজ নেন এবং সম্পর্কযুক্ত অন্যান্য লোকের সঙ্গে কথা বলেন। কিন্তু একজন সম্পাদকীয় লেখকের ক্ষেত্রে বিষয়টি পুরোপুরি গবেষণার।

সম্পাদকীয় লেখক দিনের শুরুতে তার লেখার বিষয় নির্বাচন করেন ঐ দিনের সংবাদপত্র পাঠের মধ্য দিয়ে। দিনের প্রধান সংবাদ অথবা গভীর তাৎপর্যবহনকারী অপেক্ষাকৃত ছোট সংবাদ থেকে তিনি তার লেখার বিষয় বাছাই করেন।

www.pathagar.com

লেখকের পরবর্তী কাজ হলো ঐ বিষয়ে আগে কখনও কোনো সংবাদ অথবা সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে কি না তা জানার জন্য সংবাদপত্রসমূহ দেখা। পরবর্তী কাজ ঐ বিষয়ের উৎস এবং কারণ খুঁজে দেখা। এই উৎস এবং কারণ খোঁজার জন্য সম্পাদকীয় লেখক ব্যবহার করতে পারেন বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদন, পূর্ববর্তী কোনো সম্পাদকীয় লেখনী, সরকারের বিভিন্ন বিভাগের বাৎসরিক প্রতিবেদন, বিভিন্ন এনজিওদের সংরক্ষিত তথ্য ও ডাটা ব্যাংক। এছাড়া তিনি কথা বলতে পারেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা কর্মকর্তাদের সাথে। এসমস্ত কিছুই হতে পারে সম্পাদকীয় লেখনীর ক্ষেত্রে একটি বড় তথ্য উৎস।

সংবাদপত্র

সম্পাদকীয় লেখক তার লেখার বিষয় বাছাই করেন প্রতিদিনের সংবাদপত্র থেকে। একারণে সম্পাদকীয় লেখনীর ক্ষেত্রে প্রথম তথ্য উৎস হলো সংবাদপত্র। শুধু বিষয় বাছাই নয় ঐ বিষয়সংক্রান্ত বিভিন্ন সংবাদ অথবা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন তথ্যের ভান্ডার হলো সংবাদপত্র। এ কারণে সম্পাদকীয় লেখকের আরেকটি বড় উৎস হলো সংবাদপত্র মর্গ। এ উদ্দেশ্যে আধুনিক সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতিদিনের সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ, সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয়, কলাম, গুরুত্বপূর্ণ চিঠি এসকল বিষয়ের সংরক্ষণ করে থাকে। একটি সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠান যে শুধু তার নিজস্ব সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ বা তথ্যই শুধু সংরক্ষণ করে তা নয়। সে একই সঙ্গে অন্যান্য সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদও সংরক্ষণ করে থাকে। এই সংরক্ষিত তথ্য ভাণ্ডারকে সম্পাদকীয় লেখক কাজে লাগিয়ে থাকেন।

বড় ও আধুনিক সংবাদপত্রে এই মর্গ একটি অত্যাবশকীয় জিনিস। কিন্তু অধিকাংশ ছোট সংবাদপত্রসমূহে এই সংবাদপত্র মর্গ বা আর্কাইভ থাকে না। একারণে এসকল সংবাদ পত্রের সম্পাদকীয় লেখকদের অন্য উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়।

বর্তমানে আধুনিক সংবাদপত্রগুলোতে তথ্যভাণ্ডার যুগোপযোগী করে গড়ে তোলার জন্যে কম্পিউটারের ব্যবহার হচ্ছে। অর্থাৎ তথ্য সংরক্ষণের কাজে কম্পিউটার প্রযুক্তিকে কাজে লাগাচ্ছে বড়-বড় সংবাদপত্রগুলো। ফলে একজন সম্পাদকীয় লেখককে বর্তমানে তথ্য খোঁজার জন্য অনেক কম সময় ব্যয় করতে হয়।

তবে যত আধুনিক সংবাদপত্রই হোকনা কেন সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠান সাধারণত বাইরের কোনো লোককে তার মর্গ ব্যবহারের অনুমতি দেয়না। এক্ষেত্রে ছোট সংবাদপত্রের লেখকরা (যাদের নিজস্ব কোনো মর্গ নেই বা যাদের জন্য বড় সংবাদপত্রের মর্গও নিষিদ্ধ) স্থানীয় বা জাতীয় পাঠাগারসমূহের সংরক্ষিত তথ্য ভাণ্ডারকে ব্যবহার করতে পারেন।

www.pathagar.com

সম্পাদকীয় পাতা

সম্পাদকীয় পাতা হতে পারে সম্পাদকীয় লেখকের জন্যে তথ্যের অন্যতম উৎস। নিজ পত্রিকা ছাড়াও অন্য পত্রিকার অন্য কোনো বিষয়ে লেখা সম্পাদকীয় থেকেও লেখক পেতে পারেন গুরুত্বপূর্ণ সূত্র ও তথ্য। সম্পাদকীয় পাতার অন্যান্য বিষয় যেমন উপ-সম্পাদকীয়, চিঠিপত্র, ফটোকম্পোজিশন ইত্যাদি বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্ট হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন সম্পাদকীয় লেখক। তবে এজন্য দরকার সংবাদপত্র মর্গের ব্যবহার। মর্গে রক্ষিত সম্পাদকীয় পাতার ক্লিপিংস লেখককে যোগাতে পারে অনেক তথ্য।

অন্যান্য পত্রিকা ও বইপত্র

দৈনিক সংবাদপত্র ছাড়াও সাপ্তাহিকী, মাসিক বা কোনো প্রতিষ্ঠানের মুখপাত্র কোনো সাপ্তাহিক পত্রিকা থেকে সম্পাদকীয় লেখক পেতে পারেন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কোনও তথ্য। তবে এক্ষেত্রেও লেখককে ব্যবহার করতে হবে লাইব্রেরী অথবা মর্গ।

অন্যদিকে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর লেখা বইও হতে পারে সম্পাদকীয় লেখনীর অন্যতম উৎস। যেমন ধরা যাক মধ্যপ্রাচ্য সমস্যা নিয়ে কোনো সম্পাদকীয় লেখা হবে। এক্ষেত্রে লেখককে মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কে অনেক বেশি জানতে হবে। এর সমস্যা কোথায়, ভৌগলিক অবস্থান, অধিবাসী, ধর্ম ইত্যাদি বিষয় নিয়ে জানতে হলে তাকে মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কে লেখা বইসমূহ পড়তে হবে। কারণ সংবাদপত্রে অনেক সময় খুঁটি-নাঁটি বিষয় লেখা থাকেনা। অথচ এই খুঁটি-নাঁটি বিষয়ই হয়ত অনেক বড় ইঙ্গিত বহন করে। সুতরাং এসকল ক্ষেত্রে বই হতে পারে লেখকের জন্যে অন্যতম তথ্য উৎস।

এনসাইক্লোপেডিয়া, ডিকশনারী, ইনডেক্স ইত্যাদি

এনসাইক্লোপেডিয়াসমূহ হলো জ্ঞানের ভাণ্ডার। যে কোনো বিষয় সম্বন্ধে এনসাইক্লোপেডিয়াগুলো মোটামুটি একটা বর্ণনা দিয়ে থাকে যা হতে পারে সম্পাদকীয় লেখনীর উৎস। এছাড়া ডিকশনারী, ইনডেক্স, ডাইজেস্ট ইত্যাদি বিষয়গুলো অন্যতম তথ্য-উৎস হিসেবে কাজ করে। বিশেষ করে সাহিত্য বা কোনো বিষয়ে গবেষণা সংক্রান্ত কোনো লেখার জন্যেও এসকল ডিকনশনারী, ইনডেক্স ও ডাইজেস্ট অনেক বেশি কার্যকর।

সরকারি-বেসরকারি বাৎসরিক প্রতিবেদন

সরকারের বিভিন্ন দপ্তর বৎসর শেষে তাদের কার্যবিবরণী নিয়ে একটি বাৎসরিক প্রতিবেদন তৈরি করে। বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থাসমূহও এ ধরনের প্রতিবেদন তৈরি করে থাকে। এসকল প্রতিবেদনসমূহ হতে পারে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উৎস। কারণ এসকল প্রতিবেদনে

www.pathagar.com

সাধারণত অনেক ডাটা ও স্টাটিস্টিকস ব্যবহার করা হয়ে থাকে যা সম্পাদকীয় লেখক তার লেখায় ব্যবহার করতে পারেন।

সরকারের বিভিন্ন বিভাগের রেফারেন্স

সরকারি যেকোন সিদ্ধান্ত নিয়ে সম্পাদকীয় লিখতে চাইলে লেখককে সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলতে হবে। অনেক সময় একটি বিষয়ে লেখার জন্যে লেখককে হয়ত তিন/চারটি বিভাগের রেফারেন্স নিতে হতে পারে। কর্তৃপক্ষ ছাড়াও রেফারেন্স হতে পারে ঐ প্রতিষ্ঠানের কোনো রিভিউ বই, কোনো সাময়িকী, কোনো বাৎসরিক প্রতিবেদন অথবা নতুন প্রণীত কোনো রেগুলেশন।

ধরা যাক, কোনো সম্পাদকীয় লেখক নির্বাচন বিষয়ক কোনো নতুন আইন নিয়ে সম্পাদকীয় লিখবেন। এক্ষেত্রে প্রথমত নির্বাচন কমিশনের নতুন প্রণীত আইনটি সম্পর্কে তাকে জানতে হবে। এজন্য তিনি ব্যবহার করবেন নির্বাচন কমিশন থেকে প্রকাশিত কোনো রিভিউ। অত:পর এ ধরনের আইন প্রণয়ন করা যায় কি না তা জানার জন্যে তিনি আইন বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও আইন বিভাগের রেফারেন্স ব্যবহার করতে পারেন। এভাবে আরও বিভিন্ন বিভাগের রেফারেন্স ব্যবহারের মাধ্যমে লেখক তার সম্পাদকীয়টি বিশ্বাসযোগ্য ও সাবলীল করে তুলতে পারেন।

উপরোক্ত বিষয়সমূহ ছাড়াও সম্পাদকীয় লেখক তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান, পর্যবেক্ষণ এবং বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে আলাপকালে প্রাপ্ত অভিমতও তথ্য হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন। তবে ব্যক্তিগত সম্পর্কের ফলে প্রাপ্ত তথ্য অবশ্যই ঐ ব্যক্তির মত সাপেক্ষে প্রকাশ করা যেতে পারে। সম্পাদকীয় লেখার সময় সবসময় লক্ষ রাখতে হবে যেন তা সম্পাদকীয় আইন-ভঙ্গ না করে। বিশেষ করে কপিরাইট আইন যাতে লঙ্ঘিত না হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।

www.pathagar.com

সম্পাদকীয় পাতার পৃষ্ঠাসজ্জা

পৃষ্ঠাসজ্জা সংবাদপত্রের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। প্রতিদিন অসংখ্য সংবাদ এর সমাবেশ ঘটে পত্রিকার পাতায় পাতায়। এই সংবাদগুলো যদি পত্রিকার পাতায় এলোমেলো যেনতেনভাবে সাজানো হয় তাহলে কোনো পত্রিকাই অধিক পাঠককে ধরে রাখতে পারে না। পাঠকের চাহিদার নিরিখে গুরুত্বানুসারে সাজানো পত্রিকা নিঃসন্দেহে পাঠকের সাথে থাকবে। আর সেজন্যই একটি সংবাদপত্রের জন্য পৃষ্ঠাসজ্জার গুরুত্ব অনেক বেশি। এক্ষেত্রে সম্পাদকীয় পাতার পৃষ্ঠাসজ্জা আরো বেশি গুরুত্ববহ। কেননা এটি গুরুগম্ভীর বিষয় নিয়ে কাজ করে থাকে।

একটি পত্রিকার অন্য সবগুলো পাতা থেকে সম্পাদকীয় পাতার মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। পাতাটিতে প্রকাশক, সম্পাদক, কলামিষ্ট, অতিথি লেখকরা পাঠকের উদ্দেশ্যে মুক্তভাবে তাদের বিচার-বিশ্লেষণ দর্শন এবং ধ্যান-ধারণা প্রকাশ করে। অন্যদিকে পত্রিকার অন্যপাতাগুলো পাঠককে যতটাসম্ভব বস্তুনিষ্ঠভাবে সত্য ঘটনা তুলে ধরে। একটি পত্রিকার একমাত্র সম্পাদকীয়পাতার পাঠকই কোনো বিষয়ের ওপর মতামত আশা করে থাকে।

পৃষ্ঠাসজ্জার জন্য সম্পাদকীয়পাতার সম্পাদক প্রথমেই ঐ পাতার প্রয়োজনীয় সম্পাদকীয়, চিঠিপত্র, কলাম, কার্টুন এবং অন্যান্য বিষয় যা এ পাতায় দেয়া যায় তা বাছাই করে নেন। তিনি এ বিষয়গুলো দিয়ে পাতাটিকে কিভাবে সাজাতে হবে তারও একটি পরিকল্পনা করে নেন। কোনো কোনো সম্পাদক নিজে কিংবা অন্য কারও সহায়তায় এটি করে থাকে।

www.pathagar.com

এক্ষেত্রে দৈনিক পত্রিকাগুলোর প্রবণতা হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের ক্ষেত্রে ভিন্ন নির্দেশনা দেয়া। সম্পাদকীয় পাতার এ ধরনের বৈচিত্রময় উপস্থাপনা এবং ভিন্নমুখী বিষয়বস্তু পাঠককে আকৃষ্ট করে থাকে।

পৃষ্ঠাসজ্জার উদ্দেশ্য হচ্ছে অন্ততপক্ষে কিছু সংবাদপত্রের মাঝে নিজেকে উদ্ভাসিত করে তোলা। আগে সম্পাদকীয় পাতাগুলো ছিল ধূসর কিন্তু আজকের সম্পাদকীয় পাতা পাঠকের সময়ের সাথে লড়ছে। পাঠকের মূল্যবান সময়কে ধরার জন্য পাতাটিকে পাঠকের চাহিদার নিরিখে বড়/ছোট অক্ষর, ছবি দিয়ে সাজানো হয়। উপস্থাপনার দিক থেকে আজকের পত্রিকাগুলো গতানুগতিক নয় বরং প্রতিনিয়ত প্রতিযোগিতার মুখোমুখী হচ্ছে, যার জন্যে অনেক বেশি গতিশীল মনে হয়।

পুরনো দিনের সম্পাদকীয় পাতা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে সম্পাদকীয় পাতার চিন্তা-চেতনার শুরু। উনিশ শতকের শুরুর দিকে সম্পাদকীয় পাতা একটি পূর্ণাঙ্গ কিংবা আংশিক পাতা হিসেবে উদ্ভাসিত হলেও অন্যান্য পাতা থেকে এটিকে আলাদা করা ছিল কঠিন। সংবাদ, সম্পাদকীয় সবকিছু এক কলামে একই মাপের হরফে ছাপা হতো। কখনো কখনো সংবাদ এবং সম্পাদকীয়গুলো একটি কলামের নিচে থেকে শুরু হয়ে পরের কলামের শুরুতে গিয়ে শেষ হতো, অথবা একটি পাতার নিচে থেকে শুরু হয়ে পরের পাতার শুরুতে শেষ হতো। ১৮৩৫ সালে - 'নিউইয়র্ক সান' পত্রিকার সংবাদসহ অন্যান্য বিষয় এবং সম্পাদকীয়গুলোতে একই ধরনের হরফ ব্যবহার করা হতো। শিরোনাম ইটালিকভাবে লেখা হলেও সংবাদের বডির সাথে মিলিয়ে লেখা হতো। যা আলাদা করা যেত না। ১৮৫৯ সালে নিউইয়র্ক টাইমস-এ ৬.৫ পয়েন্টের হরফ ব্যবহার করা হতো। বর্তমানে সংবাদ ৯ অথবা ৯.৫ পয়েন্ট ব্যবহার করা হয় এবং সম্পাদকীয়তে ১২ পয়েন্ট ব্যবহার করা হয়। কাজেই ১৯ শতকের সংবাদপত্রকে অনেকবেশি এলোমেলো মনে হতো। আজকের চাইতে তখনকার সম্পাদকীয় পাতা বেশ দীর্ঘ ছিল। ১৮৭১ সালের হোরেস গ্রিলের "নিউ ইয়র্ক ট্রিবিউন" এ ৬,০০০ এর ওপরে শব্দ ধরতো। এই পত্রিকার একটি পাতা "ডেস মনিস" এ অন্যান্য উপাদানের সাথে কিছুটা অংশ কার্টুন দেয়া হতো।

হার্ষ এবং আর্থার ব্রিজবেন সম্পাদকীয় পাতায় বড় হরফ, প্রশস্ত কলাম, কয়েকটি সিন্ডিকেট কলাম দিয়ে সম্পাদকীয় পৃষ্ঠা সাজাতে শুরু করলে সম্পাদকরা ধাক্কা খান। 'দ্য নিউ ইয়র্ক আমেরিকান' পত্রিকার সম্পাদক তার নিজস্ব স্টাইলটি ব্যবহার করেছেন। তিনি তার পাতার প্রধান সম্পাদকীয়টির শিরোনামটিকে ব্যানার করেন। কলামগুলোকে কালো কিম্বা

www.pathagar.com

বাঁকা, সাদা কালি দিয়ে এবং দুই কলামের মধ্যে একটি সরু লাইন দিয়ে আলাদা করেছেন। সে সময়কার অধিকাংশ সম্পাদকীয়পাতার কলামগুলো খুব কাছাকাছি ছিল এবং একটি পাতলা রেখা দিয়ে ভাগ করা হতো। পাতাটিকে একটি বড় ধরনের কার্টুনের মাধ্যমে নাটকীয় করে তোলা হোত। আজকের পাঠক ব্যস্ত। পাঠকেরা সংবাদের শিরোনাম পড়েই বেরিয়ে যেতে চায়। ফলে সম্পাদকীয় যথেষ্ট আগ্রহোদ্দীপক না হলে পাঠককে ধরে রাখা যাবে না।

১৯৪০, ৫০ এবং ৬০ এর দশকের সম্পাদকীয় পাতার পৃষ্ঠাসজ্জার চিরাচরিত ধারা ছিল পৃষ্ঠার উপরের দিকে লম্বালম্বিভাবে কার্টুন দেয়া হোত। কার্টুনের বাদিকে এক অথবা দুই কলামে সম্পাদকীয় দেয়া হতো। প্রতিটি কলামের মাঝামাঝিতে সাদা ফাঁকা জায়গা থাকতো। বর্ডারের ব্যবহার ছিল কম। ৬০/৭০ এর দশক থেকে পৃষ্ঠাসজ্জার ক্ষেত্রে অনেক বেশি ভেঙ্গে ভেঙ্গে সাজানোর প্রবণতা দেখা দেয়। সময়ের সাথে সাথে চিঠি, কলাম, কার্টুন এবং সম্পাদকীয়গুলো গুরুত্বের ভিত্তিতে সাজানো হতো।

পরবর্তীতে এই পাতাটিকে ঢেলে সাজানো হয়। সম্পাদকীয়ের চারপাশে প্রথমে বর্ডার দেয়া হয়। কোনো কোনো পত্রিকায় বড় হরফে একটি শব্দ দিয়ে সম্পাদকীয়ের শিরোনাম লেখা হয়। মতামত এবং চিঠির ক্ষেত্রে লাল কালি ব্যবহার করা হয়।

সময়ের সাথে সাথে সম্পাদকীয় পাতায় বেশ পরিবর্তন এসেছে। নানা বিষয়ের সংযোজন ঘটেছে। সম্পাদকীয় পাতায় সম্পাদকীয় কলামের সাথে সাথে কার্টুন, চিঠি, ধর্মীয় বাণী, ইতিহাস এবং সংক্ষিপ্ত তথ্য দেয়া হয়। পাতাটি আরও বেশি গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য বর্তমানে এতে বিভিন্ন লোকের ভিন্নধর্মী অভিমত তুলে ধরা হয়। অতিথি লেখক এর লেখা বিশ্লেষণ, প্রেসের কোনো মন্তব্য অর্থাৎ অনেক বিষয়ের ভিন্নতা ঘটিয়ে পৃষ্ঠা সাজানো হয়। বর্তমানে পৃষ্ঠাসজ্জায় যথেষ্ট স্বাধীনতা রয়েছে।

একটি সম্পাদকীয় সময়ের জন্যে কঠোর, বাস্তববাদী কিংবা মলিনও হয়ে যেতে পারে। সম্পাদকীয়ের এই কণ্ঠটি দিনের পর দিন একটি পত্রিকার চরিত্রকে ফুটিয়ে তোলে। আজকের পত্রিকার পাঠক শিক্ষিত এবং মার্জিত। ফলে সম্পাদকীয় লেখকদের অসংখ্য বিষয়ের মাঝ থেকে পেশাভিত্তিক বিশ্লেষণ দিয়ে থাকে। চলমান ঘটনা সব সময় পাঠকের কাছে আগ্রহের সৃষ্টি করে।

মালিক, প্রকাশক, সম্পাদকীয় পাতার সম্পাদক এবং তাদের পেশাগত সম্পর্কের ওপর পত্রিকা অনেকটা প্রভাব ফেলে। পাতার বিষয়বস্তু বাছাই, কী স্টাইলে লেখা হবে, উপস্থাপনের সুরটা কী হবে এই সমস্ত কিছুর মধ্যে সমন্বয় থাকতে হবে।

www.pathagar.com

সম্পাদকীয়পাতা সাজানোর আগে পাতার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সম্পর্কে জানতে হবে। (১) শব্দ সৈনিক অর্থাৎ পাঠক, সম্পাদকীয় লেখক, কলামিস্টদের শব্দের বাছাই এবং যথাযথ উপস্থাপন। (২) চিত্র সৈনিক অর্থাৎ কার্টুনিস্ট, ফটোগ্রাফার এবং লে-আউট ডিজাইনার। (৩) বিজ্ঞাপনদাতা যারা এই পাতাটির জন্য বিজ্ঞাপন দেয়। নিউইয়র্ক টাইমস এবং ওয়াশিংটন ইভিনিং স্টার পত্রিকার সম্পাদকেরা আরো ব্যাপক মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য বিজ্ঞাপন রাজস্বকে ব্যয় করে থাকে।

একটি সম্পাদকীয়পাতার শব্দ সৈনিক আর ছবি সৈনিক কেউ কাউকে ছাড় দিতে চায় না; কিন্তু দুটোই পাতার জন্য সমান গুরুত্বপূর্ণ এবং একে অন্যের পরিপূরক। সম্পাদকীয়পাতার সম্পাদক এ সবগুলোর সমন্বয় ঘটিয়ে পুরো পাতার মধ্যে একটি সামঞ্জস্য আনার চেষ্টা করে। কেননা বড় লেখা, বড় বড় ছবি, জটিল মেকআপ পাতার প্রতি পাঠকের আগ্রহকে নষ্ট করে দিতে পারে।

এই পাতাটিকে সাজাতে গিয়ে কয়েকটি বিষয় মনে রাখাতে হয় ঃ

১। একটি দৈনিক পত্রিকা প্রতিদিন কতকগুলো মৌলিক প্রত্যাশা নিয়ে এগিয়ে যায় তা হচ্ছে, বিষয়টি বিতর্কিত হবে না এবং এর গুরুত্ব গণমানুষের মধ্যে থাকবে।

'দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট' পত্রিকাটির একটি সিদ্ধান্ত হচ্ছে, সম্পাদকীয় পাতায় সম্পাদকীয়, চিঠি, কার্টুন, ছোট একটি ফিচার এইসব বিষয়গুলো থাকবে। কখনো কখনো শুধুমাত্র বিষয়ের উপস্থাপনার দিক থেকে পার্থক্য হবে।

মতামত পাতায় বিভিন্ন পেশাদার ব্যক্তিবর্গ মতামত প্রকাশ করবেন।

এছাড়াও পাতার অবয়বগত সামঞ্জস্যতা থাকবে যা পাঠককে পড়তে এবং অনেক পত্রিকার মাঝেও একবাক্যে পাতাটিকে চিহ্নিত করা যাবে। দ্যা ওয়াশিংটন পোস্ট এর লক্ষ্য হচ্ছে, "A comfortable consistency without a boring redundancy...".

পৃষ্ঠার ক্ষেত্রে পত্রিকার পাতা এবং প্রেসের গুণগত মানের ওপর অক্ষর এবং ছাপা এবং ছবিগুলো আরো বেশি আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। কেননা একটি অস্পষ্ট পাতার বিষয়বস্তু কখনই অনেক পাঠকের কাছে পৌঁছায় না।

দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট এর একটি ফর্মূলা হচ্ছে, যারা খুব বিখ্যাত আর্টিস্ট নয়, কিন্তু উন্নত মানসিকতার ধারক, এনার্জেটিক তাদের দিয়ে কাজ করানো। পত্রিকার জন্য পর্যায়ক্রমে ২০ থেকে ২৫ জন ফ্রিল্যান্স আর্টিস্ট তাদেরকে দেয়া নির্ধারিত বিষয়ের (নির্বাচন, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ) ওপর ছবি একে জমা দেয়। তা থেকে বাছাই করে পাতায় ব্যবহার

www.pathagar.com

করা হয়। উল্লেখ্য, আমাদের এখানকার পত্রিকাগুলো সম্পাদকীয় পাতায় ছবি ও কার্টুনের ব্যবহার নেই বললেই চলে।

এরপর ঠিক করা হয় একই দিনে কয়টি সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয় এবং অন্যান্য বিষয় পাতায় যাবে। ঠিক তেমনিভাবে মতামত পাতার জন্য কোন বিষয়গুলো কতখানি জায়গা পাবে তাও নির্ধারিত থাকে।

সম্পাদকীয়পাতার লে-আউটের মূল হচ্ছে সরলতা। অধিকাংশ সময় পাতাটিকে লম্বালম্বিভাবে সাজানো হয়। পাতার জটিলতা কাটানোর জন্য দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট পত্রিকা সম্পাদকীয় পাতায় কোনো কলাম রুল দেয় না। লেখা, ছবি এবং খালি জায়গার সমন্বয়ে পাতাটিকে উজ্জ্বলভাবে উপস্থাপন করে। পত্রিকাটি ছোট কিন্তু বোল্ড হরফ ব্যবহার করে এবং চিঠিপত্র অপর একটি পৃষ্ঠায় দিয়ে থাকে।

সাধারণত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লেখাটির ওপর একটি চিত্র বা কার্টুন তৈরি করা হয়। সম্পাদকীয় পাতার গাম্ভীর্যতা কাটানোর জন্যে এটা করা হয়। কখনও কখনও চিত্রশিল্পী এবং ফটোগ্রাফারদের উভয়ের যৌথ প্রয়াসেও লেখার ছবি তৈরি করা হয়।

এই সব কিছু বিবেচনার পর পাতার লে-আউট এডিটর সবশেষে বিশ্লেষণ করে দেখবেন যে পাতাটিতে বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে কি না। বলা হয় "... It is almost axiomatic in layout that if a page is difficult to draw on a dummy sheet, it will be difficult to read when make up..." সম্পাদকীয় পাতায় ছবি দিতে গেয়ে কিছু জিনিস মাথায় রাখতে হবে:

১। ছবিটি ভালোভাবে আঁকা হয়েছে কি না।

কোনো কোনো চিত্রকরের চিন্তা-চেতনা ভালো কিন্তু তা কাজে পরিণত করার দক্ষতা থাকে না, আবার কেউ-কেউ ভালো আঁকতে পারে কিন্তু বিষয়ের ওপর ভালো ধারণা থাকে না।

২। ছবির মাধ্যমে লেখাটির প্রতিচ্ছবি ধ্বনিত হচ্ছে কি না।

অনেক ক্ষেত্রেই আঁকা বিষয়টি লেখার গুরুত্বের চাইতে বেশি হয়ে যায়।

৩। আঁকার বিষয়টি পাতাটির বলার ভঙ্গীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না।

যখন পাতার বলার ভঙ্গীকে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা কঠিন হয় তখন ছবি একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সারা বছর একটি সুনির্দিষ্ট ভঙ্গী তুলে ধরার মধ্যদিয়ে পত্রিকাটি

www.pathagar.com

এক নিজস্ব মর্যাদা দাঁড় করায়। তবে যারা নিয়মিত সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয় পড়ে না তারা মনে করে সম্পাদকীয় সত্য ঘটনা চাইতেও অনেক বেশি কিছু বলছে।

৪। আঁকাটি বুদ্ধিদীপ্ত হয়েছে কি না।

একটি বিশ্লেষণধর্মী ছবি ব্যবহার করার আগে তা চিত্রকর এবং লে-আউট সম্পাদকের কাছে স্পষ্ট হতে হবে। কখনো কখনো এগুলো জটিল হয়। বিভিন্ন ধারণার ইঙ্গিত করে। এটিকে সমানুভূতি সম্পন্ন হতে হবে।

৫। ছবির আকার লম্বা কিংবা আড়াআড়ি বা অন্য কোনো আকারের হবে কি না এ ব্যাপারে কোনো মাপকাঠি নেই। চাহিদা নিরীখে যাচাই করে নিতে হবে।

'সম্পাদকীয় পাতা কিম্বা অন্য যে কোন পাতার ভালো ডিজাইনের প্রথম স্বাদই হচ্ছে পাঠযোগ্যতা'।

এটা প্রায় সত্যি যে, যদি কোনো পাতাকে ডামি সিটে সাজানো কঠিন হয়ে পড়ে তাহলে পৃষ্ঠাসজ্জার পর এটি পড়তেও কষ্ট হয়ে। পৃষ্ঠাসজ্জা স্বার্থক হবার প্রথম কথাই হচ্ছে পাঠযোগ্যতা। একজন পাঠক জানে না আজকে কোন লেখাটি কিংবা কোন উপাদানটি গুরুত্ব পাচ্ছে। অথবা কোনটি আজকের জন্য সবচেয়ে আগ্রহোদ্দীপক বিষয়। পৃষ্ঠাসজ্জার মাধ্যমে এগুলো পাঠকের কাছে স্পষ্ট এবং সহজপাঠ্য এবং আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।

মতামত পাতা

বিশ দশক-এর শেষ এবং ত্রিশ দশক এর শুরুর দিকে নিউ ইয়র্ক ওয়ার্ল্ড পত্রিকা মতামত পাতা প্রচলন করেন। সে সময় পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন ওয়াল্টার লিপম্যান। সম্পাদকীয় পাতা সজ্জায় এটি একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। বর্তমানে অধিকাংশ পত্রিকায় এ ধরনের একটি পাতা প্রকাশ করা হয়।

বর্তমানে সাংবাদিক ছাড়াও বিভিন্ন ব্যক্তিকে সম্পাদকীয় পাতায় অর্ন্তভূক্ত করা হচ্ছে। এই প্রচেষ্টার শুরু ১৯৭০ এর মইলওকি জার্নাল এর মধ্যে দিয়ে। এতে মেয়র, আইনজীবী, পুলিশও অন্তর্ভুক্ত হয়। এসব কলামগুলো ৬০০ থেকে ৭০০ শব্দের মধ্যে হয়ে থাকে। এ ধরনের লেখকরা শুরুতে কোনো সম্মানী পেতেন না, কিন্তু বর্তমানে সম্মানী দেয়া হয়ে থাকে। তবে এসব ব্যস্ত ব্যক্তিদের দিয়ে কলাম লেখানোর অসুবিধা হচ্ছে লেখনীটিকে প্রায়শই দ্বিতীয়বার দেখানোর সুযোগ থাকে না।

কোনো কোনো পত্রিকায় স্থানীয়, জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়ের ওপর লেখা আহবান করা হয়। কখনো পাতার একটি অংশে কোনো উল্লেখযোগ্য বিষয়ের বিশ্লেষণ দেয়া হয়।

www.pathagar.com

বর্তমানে পাঠকের সম্পৃক্ততার কথা মাতায় রেখে পৃষ্ঠা সাজানো হয়। কখনো কখনো কোনো প্রশ্নের উত্তর পাঠকদের কাছে চাওয়া হয়। টাইমস এর সাংবাদিক রবটা টি পিটম্যান সাতটি উপাদানের কথা বলেছেন। যার মাধ্যমে পাঠককে এ পাতায় সংশ্লিষ্ট করা সম্ভব।

১। কোনো ইস্যু সম্পর্কে পাঠককে সরাসরি প্রশ্ন করা।

২। কিভাবে এ বিষয়ে এগুনো যেতে পারে সেজন্য একটি বিশ্লেষণ থাকতে পারে।

৩। হ্যা এবং না যুক্তি উপস্থাপন।

৪। কলামের মধ্যে পাঠকের মতামত রাখার জায়গা থাকতে হবে।

মুলত সম্পাদকীয় এবং প্রবন্ধে সংবাদের বিশ্লেষণ দেয় হয় পাঠককে ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট করার জন্য।

আগেকার পাতা থেকে এখনকার পাতাগুলোতে অনেক বেশি নতুনত্ব এসেছে। সম্পাদকীয় পাতার পৃষ্ঠাসজ্জা এবং বিষয়বস্তুর দিক থেকেও ভিন্নমাত্রা যোগ হয়েছে। পত্রিকাগুলো তাদের গতানুগতিক বিষয় থেকে বাইরে চলে এসেছে। বর্তমানে সম্পাদকীয় পাতায় সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয়, কার্টুন, চিঠিপত্র ছাড়াও মতামত পাতা, অতিথি লেখকদের লেখা, সম্পাদকের প্রশ্নোত্তর সমালোচনা, মন্তব্য ইত্যাদি বিষয়গুলো দেয়া হচ্ছে। এসব প্রচেষ্টার মাধ্যমে পাঠককে বোঝানোর চেষ্টা করা হয় যে পত্রিকাটি তাদের মধ্যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

সম্পাদকীয় পাতার সংযোজন এবং বিষয় বাছাই এর উদ্দেশ্য হচ্ছে পাঠককে অনেক বেশি বেশি বিষয় নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করার জন্য উৎসাহিত করা। পৃষ্ঠাসজ্জার উদ্দেশ্য পাঠককে আকৃষ্ট করা এবং এর মনোযোগকে ধরে রাখা। পৃষ্ঠাসজ্জা নিজে পাঠকের জন্যে কোনো বার্তা বয়ে আনে না, কিন্তু এটি পত্রিকার চরিত্র বুঝতে সাহায্য করে।

সম্পাদকীয় পাতার পৃষ্ঠাসজ্জার মূল উদ্দেশ্য হলো এটি যে সংবাদ পাতা থেকে আলাদা তা বোঝানো। এজন্য সংবাদ কলাম থেকে সম্পাদকীয় কলাম সাধারণত প্রশস্ত হয়ে থাকে। এছাড়া অক্ষরগুলো বড় হয়ে থাকে। শিরোনামটি বিভিন্ন আকারের অক্ষর ব্যবহার করতে পারে সম্পাদকীয়তে। ছবি ব্যবহার হতে পারে।

একটি পত্রিকার ধরন পাঠককে আকৃষ্ট করে। পৃষ্ঠাটিকে এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে পাতাটিকে দেখেই যেন একজন বলতে বাধ্য হয় যে, পাতাটির পেছনে সম্পাদকের যথেষ্ট সময়, প্রচেষ্টা এবং চিন্তা ব্যয় হয়েছে এবং এটি সত্যিকার অর্থেই একটি গুরুত্বপুর্ণ পাতা।

www.pathagar.com

কয়েকটি জাতীয় পত্রিকার পৃষ্ঠাসজ্জা

আমাদের এখানকার জাতীয় দৈনিকগুলোর পৃষ্ঠা ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে সাজানো হয়ে থাকে। প্রতিটি পত্রিকা সাংবাদিকতার নীতিমালা এবং পৃষ্ঠাসজ্জার নিয়মনীতি অনুসরণ করে পৃষ্ঠা সাজিয়ে থাকে।

উদাহরণ হিসেবে এখানে কয়েকটি বাংলা এবং ইংরেজি পত্রিকার উল্লেখ করা যেতে পারে।

১। **দৈনিক ইত্তেফাকঃ** পত্রিকার ৪র্থ পাতা সম্পাদকীয়ের জন্য বরাদ্দ। পত্রিকাটিতে ২টি বা ৩টি সম্পাদকীয় পাতার বায়ে ছাপা হয়। উপ-সম্পাদকীয় একটি করে প্রতিদিন ছাপা হয়। উপ-সম্পাদকীয়ের নিচে থাকে চিঠিপত্র কলাম। পত্রিকাটি বরাবর সাধু ভাষা ব্যবহার করলেও সম্প্রতি এটি সাধু এবং চলিতভাষা দুটোই ব্যবহার করছে। শুরুরদিকে মতামত পাতা ছিল না। বর্তমানে সম্পাদকীয়পাতার পরবর্তী পাতাটি মতামত পাতা হিসেবে ছাপা হয়। এই পত্রিকায় এই দুটি পাতায় কোনরকম ছবি, কার্টুন ব্যবহার করা হয় না। উপ-সম্পাদকীয়তে ছদ্মনাম ব্যবহার করা হয়।

২। **জনকণ্ঠঃ** পাতার বা দিকে দুইটি সম্পাদকীয়, এর নিচে সংক্ষিপ্ত আন্তর্জাতিক সংবাদ, মাঝখানে ১টি উপ-সম্পাদকীয়, আল-কুরআন, বচন, স্মরণীয়, পরামর্শ, জানা-অজানা, চিঠিপত্র কলাম। ডান দিকে কিছু সংবাদ দেয়া হয়। এতে কার্টুন-এর ব্যবহার নেই।

৩। **সংবাদঃ** পাতার বায়ে দুটি সম্পাদকীয় থাকে। ডানদিকে একটি উপ-সম্পাদকীয় এবং পাতার নিচের অংশে চিঠিপত্র ছাপা হয়।

৪। **দৈনিক ইনকিলাবঃ** সম্পাদকীয় পাতার বাঁয়ে ২টি সম্পাদকীয় ডানদিকে ১টি উপ-সম্পাদকীয়, নিচের দিকে চিঠিপত্রের কলাম দিয়ে সাজানো হয়। এখানে কোনো ছবি, কার্টুনের ব্যবহার নেই।

৫। **ভোরের কাগজঃ** পত্রিকার বায়ে ১টি কিংবা ২টি সম্পাদকীয়। এর নীচে চিঠিপত্র এবং পাতার ডান দিকে উপ-সম্পাদকীয় কিংবা বিশেষ ইস্যুর ওপর সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপুর্ণ ব্যক্তির সাক্ষাৎকার ছাপা হয়। এর পরের পাতায় মতামত ছাপা হয়। এই পত্রিকায় লেখকদের ছবি ছাপা হয়। তবে কোনো কার্টুন দেয়া হয় না।

৬। **প্রথম আলোঃ** পাতার বা দিকে ২টি সম্পাদকীয়। এর নিচে কোনো একটি আলোচিত বিষয়ের উপর পাঠকের একটি অভিমত ছাপা হয়। পাতার ডান দিকে ২টি উপ-সম্পাদকীয়। নীচে চিঠিপত্র ছাপা হয়। পাতাটিকে ছবি, ইলাট্রেশন ছাপা হয়। এই পত্রিকাটির একটি মতামত বা অভিমত পাতা রয়েছে।

www.pathagar.com

৭। **দ্য বাংলাদেশ অবজারভারঃ** পাতার বাঁ দিকে ২টি সম্পাদকীয়। মাঝে ৩টি উপ-সম্পাদকীয়, প্রবন্ধ, অভিমত প্রচার করা হয়। এছাড়া ডানদিকে চিঠিপত্র ছাপা হয়। পত্রিকাটি কোনরকম ছবি, কার্টুন ব্যবহার করে না।

৮। **দ্য ডেইলী স্টারঃ** পত্রিকাটিতে ২টি পাতা মিলিয়ে সম্পাদকীয় বিষয়গুলো ছাপা হয়। একটিতে পাতার বাঁ দিকে ১টি সম্পাদকীয়, ৩টি উপ-সম্পাদকীয়, প্রবন্ধ, মতামত ছাপা হয়। অপর পাতাটিতে শুধুমাত্র চিঠিপত্র ছাপা হয়। এতে চিঠির সাথে ছবি, নানা ধরনের ইলাস্ট্রেশনও ছাপা হয়। লেখকের ছবিও ব্যবহার করা হয়। এছাড়া এ পাতায় মাঝে মাঝে চিঠির সাথে মিলিয়ে কার্টুনও দেয়া হয়।

৯। **দ্য ইনডিপেন্ডেন্টঃ** ২টি বা ৩টি সম্পাদকীয় পাতার বায়ে দেয়া হয়। মাঝামাঝি জায়গায় ২টি উপ-সম্পাদকীয় ছাপা হয়। পাতার ডান দিকের ওপরে অভিমত এবং এবং নিচে চিঠিপত্র ছাপা হয়।

www.pathagar.com

সম্পাদকীয় লেখকের দায়িত্ব ও গুণাবলী

সম্পাদকীয় লেখকের দায়িত্ব

১। পত্রিকায় মতামত প্রকাশের একমাত্র জায়গা সম্পাদকীয়। ফলে একজন সাংবাদিক অবশ্যই দায়িত্ববান এবং পেশার প্রতি দায়িত্বশীল হবেন।

২। পত্রিকা এবং পত্রিকার নীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবেন।

৩। প্রত্যেক সম্পাদকীয় লেখক তার পত্রিকার মাধ্যমে যে কোন গুরুত্বপুর্ণ বিষয়ের প্রতি তাদের মতামতটি জানিয়ে দেবেন।

৪। সম্পাদকীয় লেখক যে কোন বিষয়ে মতামত দেবার আগে খোঁজখবর নেবেন, যাচাই বাছাই করে সঠিক পথটি দেখাবেন।

৫। সম্পাদকীয় লেখককে বস্তুনিষ্ট, পক্ষপাতহীন হতে হবে। তিনি অপপ্রচার, কুৎসার ব্যাপারে সতর্ক থাকবেন।

৬। পাঠককে ইতিবাচক দিকে ধাবিত করাই তার দায়িত্ব।

৭। সম্পাদকীয় মতামতের মাধ্যমে পত্রিকাটির গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানো এবং সমাজের বিবেকবান ব্যক্তিদের আস্থা অর্জন করার চেষ্টা করবেন।

৮। যা দেখবো তা লিখবো এমনটি নয়।

৯। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে মনে সাহস রাখবেন।

১০। সম্পাদকীয় লেখার ক্ষেত্রে অপর্যাপ্ত বর্ণনা দেয়া চলবে না। বক্তব্যকে উজ্জ্বল করতে

www.pathagar.com

গিয়ে প্রতিপক্ষীয় বক্তব্য উল্লেখ করতে হবে। তবে এর ভিড়ে যেন পাঠক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে ব্যর্থ না হয়। এটি সম্পাদকীয় লেখার নীতি হিসেবে গ্রহণ করা উচিত।

১১। অলংকরণ এবং অনাবশ্যক বিশ্লেষণবহুল শব্দ ব্যবহারের মোহ ত্যাগ করতে হবে।

১২। পাঠকের গ্রহণ ক্ষমতার দিকে লক্ষ রেখে সম্পাদকীয় লেখার ভাষা সরল ও সাবলীল করতে হবে। অনাবশ্যক দীর্ঘ বাক্য যাতে না হয় সেদিকে লক্ষ রাখা প্রয়োজন।

১৩। প্রতিটি অনুচ্ছেদে বক্তব্যকে স্পষ্ট করে তুলতে হবে। কোনো কোনো বিদেশী পত্রিকায় একবাক্যে একটি অনুচ্ছেদে লেখার রেওয়াজ রয়েছে।

১৪। সম্পাদকীয়তে একটিমাত্র সুনির্দিষ্ট বক্তব্য থাকা চাই। মানু আর্নল্ডের মতে জনগণ সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট বক্তব্য চায়।

১৫। ইতিহাস, সমস্যা, আকাঙ্খার সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে।

১৬। তথ্য প্রদান ও বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য স্পষ্ট হওয়া চাই।

১৭। সাধারণের বিশ্বাস হচ্ছে সম্পাদকীয় পাঠক কম। সেজন্যে শুরুটাকে সুন্দর, তীক্ষ্ণ এবং কৌতুহলদ্দীপকভাবে উপস্থিত করতে হবে। আবেদনহীন, ব্যক্তিগত মতামত দিয়ে কিংবা গতানুগতিক হলে পাঠকের আগ্রহ কমে যাবে।

১৮। লেখার একটি নিজস্ব ভঙ্গী থাকতে হবে। এজন্যে পরিশ্রম ও অধ্যবসায় প্রয়োজন।

১৯। যুক্তিতর্কগুলো সাধারণের শিক্ষা ও জনগণের কথা মনে রেখে করতে হবে।

২০। সম্পাদকীয় লেখক পত্রিকায় নীতির প্রতি বিশ্বস্ত হবেন।

২১। নিজের মতকে পাঠকের ওপর চাপিয়ে দেবার প্রবণতা পরিহার করবেন।

২২। সম্পাদকীয় লেখার বৈশিষ্ট্য ও বিষয়বস্তু উপস্থাপনের ধারা হবে সংক্ষিপ্ত, সুনির্দিষ্ট, সুন্দর ও ইতিবাচক।

২৩। সমালোচনা নয়, ইতিবাচক সমালোচনার মাধ্যমে পাঠকের করণীয় তুলে ধরতে হবে।

সম্পাদকীয় লেখকের বৈশিষ্ট্য

১। সম্পাদকীয় লেখকের লেখার তীব্র আকাঙ্খা, লেখার সামর্থ, বিশ্লেষণের ক্ষমতা, সব বিষয়ে কৌতূহল থাকতে হবে।

২। কিছু লোক স্বভাবতই কৌতুহলী হয়ে থাকে। জানার আগ্রহ না থাকলে সফল হওয়া যায় না। সাংবাদিককে পেশার খাতিরেই কৌতূহলী হতে হবে।

৩। পড়া এবং লেখার অভ্যাস থাকতে হবে।

www.pathagar.com

৪। জ্ঞানস্পৃহা থাকতে হবে। পরিবর্তিত সমাজের সাথে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যেতে হবে।

৫। লেখককে কঠোর পরিশ্রমী হতে হবে। শত চাপের মুখেও কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।

৬। বুদ্ধিমত্তা থাকতে হবে। অসংখ্য তথ্যের ভীড়ে কোন তথ্যটি সত্য বা ন্যায়পুর্ণ তা বিচার করার ক্ষমতা অন্য যে কোন ব্যক্তির চেয়ে সাংবাদিকের অনেক বেশি থাকবে।

৭। বিশ্লেষণধর্মী মন থাকতে হবে।

৮। অনেক বেশি সামাজিক হতে হবে। পরিচিতির পরিধি হবে দেশ ছাড়িয়ে বর্হিবিশ্বে।

৯। তিনি হবেন নম্র, উদার এবং বিবেকবান । পেশার প্রতি আন্তরিকতা ও আত্মোৎসর্গের স্পৃহা থাকবে তার।

১০। কল্পনার আশ্রয় নেবেন না। লোভের বশবর্তী হয়ে কোনো লেখা লিখবেন না। ব্যক্তি হিসেবে তিনি হবেন নির্লোভ।

১১। দ্বিমুখী মনের (Bifocal/mind) অধিকারী হতে হবে। তিনি কোনো ঘটনার তথ্যগত দিকটির খোঁজ নেবেন। আবার কোনো অর্ন্তনিহিত বা তত্ত্বগত দিকটিও বোঝার চেষ্টা করবেন।

১২। অন্যের ভালো দিকটি গ্রহণ করার মানসিকতা থাকতে হবে। পাঠকের প্রস্তুতি এবং চাহিদা বুঝতে হবে। এক্ষেত্রে লেখকের জ্ঞানার্জনের বিকল্প নেই।

লেখাকে গ্রহণযোগ্য করতে হলে

১। সুস্পষ্ট হতে হবে। ঘটনার পটভূমি দিতে হবে। অস্পষ্টতা দূর করে যতটা সম্ভব প্রত্যেক শ্রেণীর পাঠকের পাঠযোগ্য করে লিখতে হবে।

২। অস্বচ্ছ লেখা পরিহার করতে হবে। আজকের সমস্যাসংকুল বিশ্বে পাঠককে ধরতে হলে লেখার স্বচ্ছতা, সহজবোধ্যতা প্রয়োজন।

৩। লেখা গতিশীল করতে হবে। লেখা গতিশীল করতে হলে সচেতন হতে হবে। তাবৎ বিশ্বের সবকিছু পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

www.pathagar.com

সম্পাদকীয় পাঠক

একটি সংবাদপত্রের পুরোটাই একজন ব্যক্তি পড়ে না। ব্যক্তি বিশেষে প্রতিটি মানুষের আচার-আচরণ, বিশ্বাস, মুল্যবোধ ভিন্ন-ভিন্ন হয়ে থাকে। মানুষের আচরণ, তার বিশ্বাস ও মূল্যবোধের সাথে জড়িত। মানুষ যা বিশ্বাস করে তার মতামতের মধ্য দিয়ে তারই বহি:প্রকাশ ঘটে। ব্যক্তি তার রুচি, বিশ্বাস এবং মুল্যবোধ এর ভিত্তিতে ভিন্ন-ভিন্ন বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়। আর সেজন্যই সংবাদপত্রে বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করা হয়। প্রতিটি পাঠক তার রুচি মাফিক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, খেলাধূলা ইত্যাদি বিষয়ের সংবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। ভিন্ন বয়স, ভিন্ন শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং সমাজের চাহিদা অনুযায়ী পাঠক সংবাদ পড়ে থাকে।

এক্ষেত্রে সম্পাদকীয় পাঠক শ্রেণী একটু ভিন্ন। বলা হয় সমাজের বিবেকবান, মতামত প্রতিষ্ঠা করতে পারে এমন ব্যক্তিবর্গ এবং সমাজের শিক্ষিত সচেতন ব্যক্তিরা সম্পাদকীয় পড়ে থাকে। অর্থাৎ সম্পাদকীয়ের পাঠক নির্ধারিত ব্যক্তিবর্গ যারা সমাজ সচেতন, সন্দেহপ্রবণ, অনুসন্ধিৎসু, কোনো বিষয়ের প্রতি অতিমাত্রায় সচেতন, এবং মতামত প্রতিষ্ঠাকারী। জনমত গঠনে সম্পাদকীয়ের রয়েছে প্রবল ভূমিকা। একটি সম্পাদকীয়ের ইতিবাচক মূল্যায়ন সমাজের প্রতিটি ব্যক্তির জন্য অত্যন্ত তাৎপর্য বহন করে।

আজকের যেকোন সাহিত্য, লেখা-লেখি তথা সম্পাদকীয় কিছু পাঠককে মডেল ধরে লেখা হয়ে থাকে। এই পাঠকদের মধ্যে রয়েছে মধ্যস্থতাকারী পাঠক, তথ্য প্রক্রিয়ায়

www.pathagar.com

সাহায্য করে এমন ধরনের পাঠক, মর্যাদা রক্ষাকারী পাঠক, অন্যকে খুশী করে এমন ধরনের পাঠক, সমস্যা সমাধানকারী পাঠক, কোনো গ্রুপের সদস্য, নিয়ম মাফিক পাঠক। এক সময় মনে করা হতো সম্পাদকীয়ের পাঠক সংখ্যা কম। ব্যপক পাঠকের জন্যে এটি লেখা হয় না। এর প্রতি মানুষের আগ্রহ কম। মার্কিন গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞ কেনেথ রিস্ট্রম তাঁর "দি হোয়াই হু এ্যান্ড হাউ অব এডিটরিয়াল পেজ" গ্রন্থে লিখেছেন, "কয়েক বছর আগেও সম্পাদকীয় পাঠকের সংখ্যাল্পতা মেনে নিতে একে ব্যাখ্যা করা হতো টু স্টেপ থিওরি দিয়ে। এই মতানুসারে মতামত নিয়ন্ত্রণকারীদের মাধ্যমে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কাছে বার্তা পৌছাতো যার মধ্য দিয়ে সম্পাদকীয় ব্যাপক জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রভাব ফেলতে পারে। এক্ষেত্রে পাঠকের গ্রহণক্ষমতা অথবা যোগাযোগকারীর সর্বোচ্চ বিশ্বাসযোগ্যতা রক্ষা হচ্ছে সম্পাদকীয়ের আদর্শ কৌশল। লেখক জানেন একেকজন পাঠক একেকভাবে গ্রহণ বা বর্জন করে থাকে। এজন্য লেখককে সম্পাদকীয়ের বিষয়ের গুরুত্ব বুঝতে হবে। এর পর কোন ধরনের পাঠক লেখাটি পড়ছে তাদের ব্যক্তিত্ব, সামাজিক পদ-মর্যাদা বিবেচনায় রেখে বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিষয়টিকে তুলে আনতে হবে যা লেখকের প্রত্যাশা অনুসারে পাঠককে প্রভাবিত করতে পারবে।

যখন একজন পাঠক সকালে পাতা উল্টায় সে উৎফুল্ল কিংবা হতাশ হয়। সম্পাদকীয় এমনভাবে লেখা উচিত যা পাঠকের প্রতিক্রিয়াকে উদ্বুদ্ধ করবে। সম্পাদকীয় পাঠককে সেসব তথ্য সরবরাহ করবে যা সে ইতোপূর্বে পায়নি অথবা সেটা হবে যৌক্তিক বিতর্ক যা সে কখনই বিবেচনা করেনি অথবা কোনো এক ধরনের (১) লেখার স্টাইল দেখে মুগ্ধ হবে (২) যদি পাঠক সম্পাদকীয় পড়ে কোনো রকম প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত না করে এবং তারা ভাবে এটা কী? সে সম্পাদকীয় নির্বোধ, তত্ত্বভিত্তিক নয়, খুবই নিম্নমানের লিখিত এবং পত্রিকাটি শুধুমাত্র জায়গাটির অপচয় করেছে।

সব সম্পাদকীয় অবশ্যই একই ধরনের পাঠকের কাছে একই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না। কোনো সম্পাদকীয় কেবলমাত্র তথ্যকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দেয়। অন্যগুলো হয়তো বা উদ্বুদ্ধ করে কিংবা কেবলমাত্র বিনোদন দেয়। কেউ কেউ শুধুমাত্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। আবার কিছু সংখ্যক উল্লেখযোগ্য পাঠক যারা সিদ্ধান্তকে নিয়ন্ত্রণ করে তারা জোরালো প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। অন্যান্য সম্পাদকীয় এক বিশাল সংখ্যক পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষন করে। একটি ভালো সম্পাদকীয় বিভিন্ন ধরনের পাঠকের মুখোমুখি হয়। তাই বলে সব পাঠকই চিঠি, টেলিফোন, আলোচনা-সমালোচনার মাধ্যমে তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে না।

অধিকাংশ সময়ই সম্পাদকীয় কোনো ঘটনার ক্ষেত্রে একটি কাঠামো প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সম্পাদকীয় বিভিন্ন ঘটনাকে প্রতিষ্ঠা করে। যা ঘটনাকে

www.pathagar.com

বর্ণনা করে এবং বাইরের প্রেক্ষাপটে ব্যাখ্যা করে। একইভাবে যখন কোনো একটি পত্রিকা একটি বিশেষ বিষয়ের প্রতি অপ্রত্যাশিত অবস্থান নেয় যার সাথে তারা একমত পোষণ করে। এ কারণেই ভিন্নমুখী যুক্তিগুলোকেও নতুন করে ভাবাতে পারে।

সম্পাদকীয় অন্যান্য আরো অনেক কিছু করে থাকে। এটি সরকারি এবং বেসরকারি জীবনে সিদ্ধান্তদাতাকেও পর্যবেক্ষণ করে। যা পরবর্তীতে নিজের পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে। ইতোমধ্যে যে সববিষয়ের প্রতি পাঠকের আগ্রহ নেই সেগুলোর প্রতিও সম্পাদকীয় আগ্রহের সৃষ্টি করে। সারা বছর ধরে সম্পাদকীয়ের মাধ্যমে কোনো জনগোষ্ঠীর মধ্যে একটি মতামত তৈরির পরিবেশ গড়ে তোলে। যার ফলে বৃহত্তর আন্দোলনের ক্ষেত্রে কোনো কোনো বিষয় গ্রহণযোগ্য হয়, কোনো কোনটি গ্রহণযোগ্য হয় না। এমনকি অতি অল্প সময়ের মধ্যে সম্পাদকীয় গৃহীত সিদ্ধান্তের পরিবর্তনও ঘটাতে পারে। তবে কোনো সম্পাদকীয় যদি কোনো একটি বিষয় ঘটানোর জন্যে ঘটানো হয় তবে তা গ্রহণ করা হয়না। কোনো একটি পরিস্থিতিকে আরো স্বচ্ছ করে তোলার জন্য সম্পাদকীয় আরো কার্যকর যুক্তির মাধ্যমে পাঠককে প্রভাবিত করে। কিভাবে একটি সম্পাদকীয় প্রভাবিত করে এবং পাঠকের মধ্যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে তার একটি উদাহরণ এমন- "১৯৭০ সালে প্রেসিডেন্ট নিক্সন কর্তৃক সুপ্রীম কোর্টের বিচারক হিসেবে জাজ জি. হ্যারল্ড কার্সওয়েল (Judge G. Harrold Carrswell) এর মনোনয়ন।"

যখন এই মনোনয়নটি ঘোষণা করা হয় তার দুই মাস আগে ঠিক একই পদের জন্য জাজ ক্লিমন্টে হায়ন্সওয়ন্টস (Judge Clement Haynswonlts) এর মনোনয়নটি নিক্সন বাতিল করেন। কিন্তু তখন এর বিরুদ্ধে সিনেট কোনো বিরোধিতা করেনি। তার নিযুক্তি স্থায়ীকরণ প্রশ্নে কিছু প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়া সত্ত্বেও তাতে মনোনয়ন দেয়া হয়। যাহোক ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝিতে বিষয়টি সংগঠন এর বিরুদ্ধে কাজ করতে আরম্ভ করে এবং ওয়াশিংটন পোস্ট এই মামলার বিরুদ্ধে তিনটি দীর্ঘ সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এই সম্পাদকীয়গুলো ছিল শুনানীর ওপর জনগণের মতামত এবং ট্রায়াল কাজ হিসেবে তার কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্যের সুক্ষ্ম বিশ্লেষণ।

সম্পাদকীয়গুলোর প্রতি পাঠক সাড়া দিয়েছিল ব্যাপকভাবে। এর কোনোটি ছিল তথ্যসমৃদ্ধ। কোনোটি বিতর্কের সৃষ্টি করে। এই সম্পাদকীয়ের প্রতিক্রিয়া ছিল ব্যাপক। বিষয়টি সর্বত্র প্রধান আলোচ্য বিষয়ে রূপ নেয়। অন্যান্য পত্রিকার সাংবাদিকরা এ থেকে উক্তি উল্লেখ করতে থাকে। এর ফলে সিনেটররা আরো বেশি সচেতন হয়ে পড়ে। সে সাথে এটি ব্যাপকভাবে জনগণের আগ্রহের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

www.pathagar.com

নিবেদন ইতি

অভাজন

দৈনিক ইত্তেফাক, নভেম্বর ১৯৯১

'মাস্তান' কাহাকে বলে? মাস্তান হইল ঐশী প্রেমে মত্ত ব্যক্তি। পার্থিব জগতের সহিত যাঁহার কোনো সংশ্রব নাই, বাস্তব জগতের লোভ, ঈর্ষা, মাৎসর্য, কামক্রোধকে অতিক্রম করিয়া যিনি অপার্থিব জগতের সাধনায় নেশাচ্ছন্ন, তিনিই মাস্তান। আগে মাস্তানের চেহারা কল্পনা করা হইত কি রকম? লম্বা চুল, লম্বা দাঁড়ি, পরনে আলখেল্লা আর আধ্যাত্মিক কথাবার্তা। কিন্তু এখন মাস্তান বলিতে কী বুঝা যায়? চুল বড় হইতে পারে আবার ছোট হওয়াও বিচিত্র নহে। পোশাক আধুনিক, কখনও কখনও অত্যাধুনিক বটে। বুকের বোতাম খোলা। মুখে গোঁফ থাকিতে পারে আবার না-ও থাকিতে পারে। দাঁড়ি থাকাও বাধ্যতামূলক ব্যাপার নহে। মাস্তান মানে এমন এক ধরনের মানব সন্তান-যাহাদের উপস্থিতি হৃদকম্প সৃষ্টি করে। তাহাদের হাতে থাকে নানাবিধ অস্ত্র। রাস্তাঘাটে নিরীহ নারী-পুরুষ যাহাদের অসহায় শিকার। পাড়ায়-পাড়ায় মহল্লায়-মহল্লায় ত্রাস সৃষ্টি করা তাহাদের কাজ। চাঁদা আদায় করার জন্য তাহাদের কোন অজুহাতের দরকার হয় না। পাড়ায় কেহ নতুন বাড়ীর ভিত উঠাইতে গেলেই মাস্তানদের সন্তুষ্ট করিতে হইবে, জায়গা কেনাবেচার সময়ও মাস্তানবাহিনীর হস্তক্ষেপ থাকিবে। কেহ কোন অফিস কিংবা কোন কারখানা খুলিলে পাড়ার মাস্তানদের জন্যে একটা নিয়মিত ব্যবস্থা থাকিতে হইবে। এখন মাস্তান বলিতে তো আমরা ইহাই বুঝি। মাস্তানদের কোন বিশেষ রাজনৈতিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন নাই। যেখানে তাহাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত হইবে, যেখানে তাহাদের কিছু উপার্জনের

www.pathagar.com

ব্যবস্থা থাকিবে, সেখানেই থাকিবে তাহাদের আনুগত্য। এই আনুগত্য স্বল্পমেয়াদী হইতে পারে, দীর্ঘ মেয়াদীও হইতে পারে। মাস্তান এবং গুন্ডার মধ্যে প্রভেদ আছে। গুন্ডা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অল্পশিক্ষিত কিংবা নিরক্ষর হয়। কিন্তু মাস্তানদের শিক্ষাক্ষেত্র মাঝারি গোছের হইতে শুরু করিয়া শিক্ষাপীঠের উচ্চস্তরেরও হইতে পারে। গুন্ডার ক্ষেত্রে ফিল্মী কায়দার প্রতিফলন নাও থাকিতে পারে; কিন্তু মাস্তানদের ক্ষেত্রে এই প্রভাব অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিদ্যমান। গুন্ডার প্রতিপত্তি এখন সমাজে কমিয়া যাইতেছে; কিন্তু মাস্তানের প্রতিপত্তি ক্রমবর্ধমান। গুন্ডার শারীরিক বল প্রয়োজন পড়ে; কিন্তু মাস্তানের বেলায় উহা না হইলেও চলে। ইদানীং পত্র-পত্রিকায় দেখা যায় মাস্তানদের নামের আগে কিছু বিশেষণও ব্যবহৃত হইতেছে। যেমন 'টাইগার' কিংবা 'গালকাটা' কিংবা কালা অমুক, ট্যারা তমুক ইত্যাদি। কখনও দৈহিক কোন গড়ন, কখনও দুর্ঘটনা বা অন্য কোন কারণজনিত অঙ্গহানি নির্দেশক নাম আসল নামের আগে-পরে জুড়িয়া এক ধরনের ভীতিপ্রদ আবহ তৈরী করা। কেহ কেহ আবার ছদ্মনামও গ্রহণ করে। অবশ্য এই ব্যাপারটি মফস্বলেই বেশী। মফস্বলে হাট-বাজার-ঘাট, জলমহাল ইত্যাদি ইজারার সময়ও দেখা যায় মাস্তানদের দাপট। মফস্বলে ইহাদের হাত করিয়া প্রভাবশালীরা ব্যবসা বাগায়, স্থানীয় রাজনীতি করে। শহরে কিংবা রাজধানীতে বিভিন্ন ধরনের টেন্ডারের সময়ও ইহাদের দৌরাত্ম্যের কথা বিভিন্ন সময় পত্রিকায় প্রকাশিতও হইয়াছে। মাস্তানদের সঙ্গে গুন্ডাদের আর একটা তফাৎ আছে। গুন্ডারা গুন্ডামি করে, মারধোর করে; কিন্তু খুব একটা জানে মারে না। আর মাস্তানরা মারধোরের দিকে বড় একটা যায় না। হয় গুলী করিয়া হত্যা করে অথবা ছোরা মারিয়া পেট এফোঁড়-ওফোঁড় করিয়া দেয়।

হালকাভাবে লেখাটা শুরু করিলেও বিষয়টি কিন্তু মোটেই হালকা নয়। সম্প্রতি মাস্তানদের তৎপরতা সর্বত্র আশঙ্কাজনক হারে বাড়িয়া গিয়াছে। মাস্তানির মধ্যে নামিয়া গিয়াছে পেশাদার খুনীরা পর্যন্ত। অথবা এমনও বলা যায় যে, অনেক মাস্তান পরিণত হইয়াছে পেশাদার খুনীতে। গত কয়েকদিনের পত্রিকা-খুলিলে দেখা যাইবে অসংখ্য খুন-খারাবির সংবাদ। গুলী করিয়া ব্যবসায়ীকে হত্যা করা হইতেছে, ছিনাইয়া লওয়া হইতেছে টাকা-পয়সা, বোমা ফুটাইয়া দোকান লুট করা হইতেছে, বাধা দিলেই সরাসরি বুলেট বক্ষ বিদীর্ণ করিতেছে। গাড়ী হাইজ্যাক, ছিনতাই পরিণত হইয়াছে নিত্যদিনের ঘটনায়। প্রতিদিন সশস্ত্র যুবক ধরা পড়িতেছে-তাদের সচিত্র সংবাদ প্রকাশিত হইতেছে সংবাদপত্রের পাতায়। হাইজ্যাকার কয়েদ খাটিয়া বাহির হইয়া আসার পরদিনই নতুন হাইজ্যাকিং এর প্রস্তুতি লইতেছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে আবার ধরা পড়িতেছে। আমাদের পত্র-পত্রিকায় ইহাই নিত্যদিনের খবর।

www.pathagar.com

কয়েকদিন আগে অপরাধ বিজ্ঞানীরা এই বিষয়টি লইয়া কিছু চিন্তা-ভাবনা করিয়াছিলেন এবং সেই খবরও পত্রিকার পাতায় প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহাদের পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, মাস্তানি কিংবা ছিনতাই এর পিছনে ব্যাপকভাবে কাজ করিতেছে মাদকাসক্তি। অর্থনৈতিক বিপর্যয় তো আছেই। দারিদ্র্য হইতে হতাশা এবং হতাশা হইতে বেপরোয়া মনোভাব ক্রমশঃ সমাজ জীবনকে গ্রাস করিতেছে। এই তো কিছুদিন আগে 'অপারেশন দুর্বার' নামে এক মাস্তান ধরা অভিযান শুরু হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে কি কোন কাজ হইয়াছে? এমন কিছুই হয় নাই। কারণ মাস্তান উৎপাদনের যন্ত্রটি তো রীতিমত সচল। পুলিশ যদি সততার সহিত মাস্তান ধরে অবশ্য এ ধরনের কথাটা নিতান্তই ইউরোপিয়ান কথাবার্তা। কারণ, নানাবিধ প্রভাব এবং অন্যান্য কারণে ইহা রীতিমত অসম্ভব- তাহা হইলেও সমাজজীবন মাস্তানমুক্ত করা সম্ভব নহে। কারণ আমাদের ভারসাম্যহীন ও অনিশ্চিত অর্থনৈতিক অঙ্গনটিই প্রতিনিয়ত নতুন হতাশার জন্ম দিয়া চলিয়াছে। তদুপরি যদি ড্রাগের সর্বনাশা প্রভাব থাকে এবং উহার বিস্তৃতি ঘটিতে থাকে তাহা হইলে তো কথাই নাই। অতএব মাস্তানদের নির্মূল করার কাজটি কেবল আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারীর হাতেই সীমাবদ্ধ নাই। এ কথাটি বোধ হয় মনে রাখা দরকার।

এখন আর একটা সমস্যা এখানে তুলিয়া ধরা দরকার। সমস্যাটি চাঁদা আদায়কারীদের লইয়া। গত কুড়িদিনে কেবল রাজধানী ঢাকাতেই চাঁদাবাজদের দৌরাত্ম্য লইয়া বেশ কয়েকটি খবর জাতীয় দৈনিকগুলিতে ছাপা হইয়াছে। রাজধানীর বেশ কয়েকটি এলাকায় চাঁদাবাজদের হাতে নাকাল ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা ধর্মঘট পর্যন্ত করিয়াছে। এলিফ্যান্ট রোডে, খিলগাঁয়ে, শ্যামবাজারে, চকবাজারে, তেজকুনিপাড়ায়, ডেমরায় দোকানদাররা প্রতিবাদ করিয়া দোকানপাট বন্ধ রাখিতে বাধ্য হইয়াছে। হয়তো বন্ধ থাকিয়াছে একদিন কিংবা দু'দিনের জন্যে। কিন্তু তাই বলিয়া চাঁদাবাজদের উৎপাত কি বন্ধ হইয়াছে? এই চাঁদা আদায়কারীদের পরিচয় কি? ইহারা কখনও রাজনৈতিক দলের নামে, কখনও ছাত্র প্রতিষ্ঠানের নামে, কখনও ক্লাবের নামে, কখনও কোনো সংগঠনের নামে চাঁদা দেওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করে, ভয় দেখায়, অনেক ক্ষেত্রে ভাংচুর পর্যন্ত করে। অথচ দেখা যায় কোন দল, প্রতিষ্ঠান, সংগঠন ইহাদের সঙ্গেকার সম্পর্ক স্বীকার করে না। কিন্তু স্থানীয়ভাবে যাহারা এই চাপের মুখোমুখি হয় তাহারা তো জানে ইহারা কে এবং কি পরিচয়ে আসে। তাহারা তো জানে, ইহাদের পশ্চাদবর্তী প্রভাব কতটুকু। অতএব কখনও দোকান চালানোর জন্য কিংবা ব্যবসায়িক অফিস অক্ষত রাখার জন্য তাহারা নতি স্বীকার করে অথবা বাড়াবাড়ি করিলে দোকানপাট বন্ধ করিয়ে দেয়। যখন দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা এতখানি বিপর্যস্ত, তখন যদি এই ধরনের ঘটনা ঘটিতে থাকে একের পর এক, তাহা হইলে পরিণতি

www.pathagar.com

কি হইবে? আর রাজধানীতে যদি এই হয় তাহা হইলে মফস্বলের অবস্থা যে কোন পর্যায়ে ঠেকিতে পারে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। একটি দৈনিকে চাঁদাবাজদের দৌরাত্ম্যের ওপর এক বিশেষ প্রতিবেদন সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে দেখা যায়, আমাদের দেশের পরিবহন ব্যবস্থা কিভাবে বড়-মাঝারি-ছোট চাঁদাবাজদের হাতে জিম্মি হইয়া পড়িয়াছে। অথচ ইহা মোকাবিলা করার ক্ষমতা কাহারও আছে বলিয়া মনে হইতেছে না। একজন সাধারণ নাগরিকের অবস্থা কি? হয় হাইজ্যাকারের হাতে পড়িতে হইবে রাস্তাঘাটে অথবা পাড়ায় মাস্তানের মাস্তানি সহ্য করিতে হইবে, নতুবা অফিসে অথবা দোকানে চাঁদাবাজের খপ্পরে পড়িতে হইবে। সবারই যে হয় এমন নহে। কিন্তু কাহারও কাহারও ক্ষেত্রে সবগুলি হয় আর কাহারও কাহারও ক্ষেত্রে ইহার মধ্যে যে কোন একটি। আর যাহাদের এখনও এই সৌভাগ্য (!) হয় নাই- তাহাদের যে হইবে না এ কথা হলফ করিয়া বলা মুশকিল।

প্রকৃত ধর্মের ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে

হাবিবুর রহমান মিলন

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৭ আগস্ট ১৯৯৪

মৌলবাদ কোন পাগলেও সমর্থন করতে পারে না। কেন পারে না এর বিশদ ব্যাখার প্রয়োজন নেই। চরমোনাইর পীর এবং জাতীয় মসজিদের খতিবের উক্তিতেই এর জবাব নিহিত। দুজনই অবশ্য ঠেলায় পড়ে বলা কথা তুলে নেয়ার চিন্তা করেছেন। বক্তব্যের সংশোধিত ভাষ্য দেয়া হয়েছে। কিন্তু বিপুল জনগোষ্ঠীর সামনে উচ্চারিত বক্তব্য কি প্রতিবাদ করলেই অসত্য হয়ে যায়? বিভিন্ন মহলে তাই আলোচনা অব্যাহত। মানিক মিয়া এভেন্যুর জনসমাবেশে চরমোনাইর পীর বলেছেন, 'মৌলবাদ যে সমর্থন করে না সে জারজ মুসলমান'। এ ধরনের উক্তি ধর্মান্ধ মৌলবাদীর পক্ষেই সম্ভব। কোন সুস্থ লোক হেন উক্তি করতে পারে না। একই কথা বায়তুল মোকাররমের খতিব সম্পর্কে। জাতীয় মসজিদের খতিব নিঃসন্দেহে একজন সম্মানিত ও মান্যবর ব্যক্তি। কিন্তু সম্মান রক্ষা নিজের ব্যাপার। তাই এ ধরনের পদ যারা অলঙ্কৃত করেন তাদের উচিত কথাবার্তায় সংযত হওয়া। কারণ একজন সাধারণ মানুষের উক্তি এ খতিবের উক্তিতে বিস্তর প্রভেদ। ইসলাম অর্থ শান্তি এবং অপর অর্থ আল্লাহর কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ। ধর্ম একটি স্পর্শকাতর বিষয়। এ সম্পর্কে কোন কিছু লেখা ও বলার সময় সর্বোচ্চ সতর্কতা গ্রহণ করা প্রয়োজন। অন্যথায় শুধু বিভ্রান্তি নয় হানাহানি জন্ম নিতে পারে। তাই পবিত্র কোরানে ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি ও কোন জবরদস্তি না করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে বার বার। ইসলাম

www.pathagar.com

এমন এক মহান ধর্ম যেখানে উগ্রতা, হিংসা, রগ কাটার বিধান নেই। হযরত মোহাম্মদ (দঃ)- এর আমলে মসজিদুল জজিরা নামে একটি মসজিদ ছিল। এর পাশেই ছিল খ্রীষ্টানদের গির্জা। এক পর্যায়ে মসজিদটি অমুসলিম কোরেশদের আড্ডায় পরিণত হয়। সে আড্ডার প্রধান বিষয়বস্তু ছিল আল্লাহ, তাঁর প্রেরিত রসুল (দঃ) ও ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা। আল্লাহর ওহি লাভ করার পর (নিজ সিদ্ধান্তে নয়) তিনি এ মসজিদ ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ দেন। ইসলামের ইতিহাসে ঐ আমলে মসজিদ ভাঙ্গার দ্বিতীয় কোন নজির নেই। কিন্তু মসজিদ ভাঙ্গা হলেও গির্জা অক্ষত রাখা হয়। এর মধ্য দিয়ে দুটি শিক্ষা পাওয়া যায়। এক আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া কোন ধর্মবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের উপাসনালয় বিনষ্ট করা যায় না এবং দুই, পরধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতা। এই সহিষ্ণুতার শিক্ষা কোরান ও হাদিসের বহু স্থানে রয়েছে। পক্ষান্তরে রাজনীতি ক্ষেত্রে ধর্মের ব্যবহার ধর্মের পবিত্রতা বিনষ্ট করার পাশাপাশি সামাজিক শান্তি ও প্রগতি ব্যাহত করতে পারে বলেই মুসলমানদের পৃথক রাষ্ট্রটি ছিল ধর্মনিরপেক্ষ। স্বয়ং হযরত মোহাম্মদ (দঃ) মদিনা সনদে এ রাষ্ট্রীয় নীতি ঘোষণা করেন। গোলাম মোস্তফা রচি 'বিশ্ব নবী' বইয়ে মদিনা সনদের পূর্ণ উল্লেখ রয়েছে। যে কেউ একবার চোখ বুলিয়ে নিলে জানতে পারবেন, ইসলাম রাজনীতে ধর্মের বেসাতি সমর্থন করে কি না। মুরতাদ সম্পর্কেও ধর্মের ব্যাখ্যা স্বচ্ছ। সুরা নিসার ১৩৭ নম্বর আয়াতে আছে, 'যারা ঈমান আনার পর কুফরী করে এবং আবার ঈমান আনে ও আবার কুফরী করে ও এরপর কুফরী প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পায় আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন না। এরা সৎ পথ লাভ করবে না।" এখানে বারবার ঈমান এনে পথভ্রষ্ট হওয়ার কথা বলা আছে। এবং আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন না এ কথাই আছে। কিন্তু মৃত্যুদন্ডের কোন বিধান নেই। অথচ মুরতাদের ফাঁসি দাবি করার পাশাপাশি ব্ল্যাসফেমি আইন দাবি করা হচ্ছে। ব্ল্যাসফেমি উৎস এবং লক্ষ্য সম্পর্কে ইতোমধ্যে বহু আলেম ওলেমা স্পষ্ট বক্তব্য দিয়েছেন। অন্যান্য শ্রেণী হতেও মত দেয়া হয়েছে। এখন এটা দেশবাসীর কাছে পরিস্কার যে, চার্চের আধিপত্য রক্ষা করার জন্য ব্রিটেনে তা চালু করা হয়েছিল। বর্তমানে ব্রিটেনেও সে আইন প্রায় অস্তিত্বহীন এবং কতিপয় সুস্পষ্ট অভিযোগ ভিত্তিক সাধারণ বা প্রচলিত আইনের আওতাধীন, বাস্তবে এর কোন কার্যকারিতা নেই। থাকতেও পারে না এ জন্য যে আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এ ধরনের আইন অচল।

'৭৫ এর পটপরিবর্তনের পর এই অচল বহু কিছু সচল করার এবং কাঠমোল্লাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দুয়ার খুলে দেয়া হয়। এ দুয়ার খোলার সাথে ধর্ম ও মানুষের মঙ্গল চিন্তা কিছুই ছিল না। প্রধান ছিল স্পর্শকাতর ধর্মীয় অনুভূতি উস্কে দিয়ে ক্ষমতার মসনদ পাকা করা। '৭৫ এর পর থেকে আজ পর্যন্ত এ ধারাই বহমান। এর আগে '৫২ থেকে '৭৫ পর্যন্ত ছিল ভিন্ন

www.pathagar.com

ধারা। '৫২ সালে বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্যে সালাম, বরকত, রফিক জীবন দেয়। তাদের শোনিতে নতুন করে জন্ম নেয় বাঙালী জাতীয়তাবাদ। ধর্মের নামে পাকিস্তানী শাসকচক্র এ জাতীয়তাবাদ ধ্বংস করার প্রচেষ্টা চালায়। প্রতিটি প্রচেষ্টা থেকে বৃদ্ধি পায় বাঙালী জাতীয়তাবাদী চেতনা। '৬৬ সালে বঙ্গবন্ধুর ৬ দফা কর্মসূচী একে আরও তীব্র করে। স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন পরিণত হয় স্বাধিকার আন্দোলনে। আইয়ুবের স্বৈরাচার এর বিরুদ্ধে ব্যবহার করে অস্ত্রের ভাষা। বঙ্গবন্ধু যেখানেই যান গ্রেফতার করে মিথ্যা মামলা করা হয়। আজ চাটগাঁ, কাল সিলেট, পরশু পঞ্চগড় এবং পরদিন অন্যত্র। এতেও জাগ্রত বাঙালীকে প্রতিহত করতে ব্যর্থ হওয়ায় দায়ের করা হয় আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা। অশ্রুতপূর্ব গণঅভ্যুত্থানে ষড়যন্ত্র মামলা ভেসে যায়। কারাগার থেকে শেখ মুজিব বঙ্গবন্ধু রূপে ফিরে আসেন। ট্রাইব্যুনালের বিচারপতি এস রহমান জুতা-জামা ফেলে পালিয়ে যান করাচী।' ৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ একক সংখ্যাগরিষ্টতা অর্জন করে। কিন্তু আইয়ুবের উত্তরসূরি নরপিশাচ ইয়াহিয়া ভুট্টোর সঙ্গে মিলে শুরু করেন চক্রান্ত, বঙ্গবন্ধু অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। সে অসহযোগ আন্দোলন ছিল ইতিহাসে নজিরবিহীন। এর পরের ঘটনা সবার জানা। '৭১ এর ২৫ মার্চ মধ্যরাতে হায়েনার আক্রমণ। একদা নিরীহ বাঙালীর মরণজয়ী যুদ্ধ ও বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা। '৫২ থেকে '৭১ পর্যন্ত সব আন্দোলনের ধারায় ছিল অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি, শোষণমুক্ত সমাজ, গণতন্ত্র ও বাঙালী জাতীয়তাবাদ। '৭৫ পর্যন্ত এ ধারা বহাল থাকে। কিন্তু একে সংহত রূপ দেয়ার জন্য আরও কিছুটা সময় প্রয়োজন ছিল। সে সময় পাওয়া যায়নি। দেশী-বিদেশী চক্রান্তে এর আগেই পটপরিবর্তন ঘটে যায়, শুরু হয় নতুন ধারার রাজনীতি। যে রাজনীতিতে অন্য যা কিছু থাক মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধগুলো নিদারুনভাবে উপেক্ষিত। অপ্রিয় হলেও সত্য যে, একজন মুক্তিযোদ্ধা সাবেক রাষ্ট্রপতি মরহুম জিয়াউর রহমানই এ ধারা প্রবর্তন করেন। আজও তাই চলছে। একদিক থেকে এটা অস্বাভাবিক নয়। '৭৫ পূর্ব রাজনৈতিক দল এবং '৭৫ পরবর্তী রাজনৈতিক দলের নীতি-দর্শন এক হতে পারে না। '৭৫ পরবর্তী রাজনৈতিক দলগুলোই গত ১৮/১৯ বছর যাবত রাষ্ট্রক্ষমতায় মুক্তিযুদ্ধের সাথে যে সব দল সম্পৃক্ত ছিল না মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সাথে সেগুলোর বিশ্বস্ত আন্তরিকতা থাকবে এ আশা অনেক বড় আশা। এর প্রতিকার করতে হলে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তিতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে রাষ্ট্রক্ষমতায় যেতে হবে। যারা বলেন, ক্ষমতার জন্য রাজনীতি করি না তাদের কাছে আমার সবিনয় জিজ্ঞাসা, তবে কিসের জন্য করেন? হয়তো বলা হবে নীতি ও আদর্শের জন্য। হয়তো বলা হবে, সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করতে হবে তাই।

আমার প্রশ্ন, ক্ষমতা ছাড়া কি নীতি ও আদর্শের বাস্তবায়ন সম্ভব! গত ১৮/১৯ বছর

www.pathagar.com

মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি ক্ষমতার বাইরে না থাকলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধগুলো কি এ দশাপ্রাপ্ত হয়? সাম্প্রদায়িক শক্তি কি এমন হিংস্র রূপ নেয়? পক্ষান্তরে সমাজ ব্যবস্থার আমূল সংস্কার সম্পর্কেও আমার ছোট্ট একটি বক্তব্য আছে। সমাজ পরিবর্তনের পথ দুটি নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে বিশ্বাস করি। যদি নিয়মতান্ত্রিক বা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী হই তা হলে এক রকম পথ। যদি না হই তা হলে পথ ভিন্ন। আজকাল বিপ্লবীদের কণ্ঠেও গণতন্ত্রের জয়গান। বামপন্থীরাও এর বাইরে নন। এখানে একটা কথা বলা দরকার যে, মুক্তিযুদ্ধে বামপন্থীদের একটি অংশের অবদান শ্রদ্ধার সাথে স্বীকার্য। আবার এও অস্বীকার করার উপায় নেই যে, বামপন্থীদের কিছু মুক্তিযুদ্ধের সময় ডিম-মুরগি এবং পিঠাপুলির সাপ্লাই ব্যবসা করতেও বাদ রাখেনি। আমরা যখন বামপন্থীদের কথা বলি, বিশেষভাবে তাদের কথাই বলি। মুক্তিযুদ্ধে অন্য যাদের অবদান স্বীকার্য তাদের সম্পর্কে বক্তব্য ভিন্ন। তবে তাহের হত্যার প্রতি উদার মনোভাব এবং খাল কাটা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী বামদের স্বাধীনতাউত্তর ভূমিকা সম্পূর্ণ ভুলে থাকা যায় না। আর যায় না বলেই যখন চায়ের পেয়ালায় ঝড় সৃষ্টি করা হয় তখন কথা বলা অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়।

মৌলবাদ তাঁর বিষ ছড়াতে ব্যস্ত। '৭১ এর পরাজিত শক্তি বিশেষ আশ্রয়ে নাদুসনুদুস হচ্ছে। চ্যালেঞ্জ করছে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তিকে। পরিস্থিতি আজ এমনই যে, খতিব শিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে পাকিস্তান ভাঙ্গার বা বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য গাদ্দার বলতে এবং চরমোনাইর পীর সত্যিকার ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের জারজ বলতে দ্বিধা করছে না। এদের হাতে প্রকৃত ধর্ম নিরাপদ নয়। তাই ধর্মের ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েই ধর্মান্ধ মৌলবাদীদের ঠেকাতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পক্ষের শক্তির ক্ষমতায় আসা ছাড়া এর প্রতিকার নেই। আর সে আসার পথ হচ্ছে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন সব কিছু দলীয়করণে উন্মত্ত কোন দরীয় সরকারের অধীনে সম্ভব নয়। এখানেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবির প্রয়োজনীয়তা ও অগ্রাধিকার।

বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের প্রকৃত পিতা কে?

আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী

দৈনিক ভোরের কাগজ, ২৬ ডিসেম্বর ১৯৯২

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত 'সাপ্তাহিক প্রবাসী' পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যা লন্ডনে আমার হাতে এসে পৌঁছেছে। পত্রিকাটির ২৭ নভেম্বরের সংখ্যায় দেখলাম বিএনপি নেতা এবং সংসদে সরকারি দলের ডেপুটি লীডার ডাঃ বদরুদ্দোজা চৌধুরী সম্প্রতি আমেরিকা সফরে

www.pathagar.com

গিয়েছিলেন এবং সেখানে এক প্রশ্নোত্তর সভায় বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদসহ বিভিন্ন প্রশ্নে কিছু গোঁজামিল উত্তর দিয়ে আত্মরক্ষা করতে চেয়েছেন। ডাঃ চৌধুরীর জন্য আমার দুঃখ হয়। বিএনপিতে যে ক'জন মুষ্টিমেয় ভালো লোক আছেন, তিনি তাদের একজন। সম্ভবতঃ এজন্যই দেশের নিয়মতান্ত্রিক প্রধান হওয়ার সকল যোগ্যতা ও গুণ থাকা সত্ত্বেও তিনি ম্যাডামের বিশ্বাস অর্জন করে 'রাষ্ট্রপতি বিশ্বাস' হতে পারেননি। এখনো কক্ষচ্যুত উল্কার মতো ম্যাডামের অন্ধ আনুগত্যের বলয়ে কেবল ঘুরে বেড়াচ্ছেন এবং 'জিয়ার জাতীয়তাবাদী দর্শন' (কাঁঠালের আমসত্ত্ব) থেকে শুরু করে গণতন্ত্র ও জাতিতত্ত্ব সম্পর্কে এমন সব কথা বলে বেড়াচ্ছেন, যার সঙ্গে ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, এমনকি বাস্তবতার সম্পর্কও খুব কম। ডাঃ বদরুদ্দোজার সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের পরিচয় ও সখ্যতা। সেই সুবাদেই বলতে পারি, বাংলাদেশ ও বাংলা ভাষার প্রতি তার ভালোবাসা কোনো খাঁটি দেশপ্রেমিকের চাইতে এতটুকু কম নয়। আমার ধারণা, তিনি মনে মনে খাঁটি বাঙালী এবং বাঙালী জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করেন। প্রকাশ্যে তিনি ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে কথা বলেছেন এবং জামাত ও মোল্লাবাদীদের বিরুদ্ধে তার মত ব্যক্ত করেছেন। তাহলে তিনি কি করে বিএনপি'র জগাখিচুরি রাজনীতিতে গিয়ে জুটলেন? আমাদের দু'জনেরই এক কমন ফ্রেন্ড আমাকে বলেছেন, 'বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আগে থেকেই বর্তমানের জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নূরুল ইসলামের সঙ্গে ডাঃ বদরুদ্দোজার সম্পর্ক ভালো ছিল না। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ডাঃ নূরুল ইসলাম প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যক্তিগত চিকিৎসক নিযুক্ত হন। তখন থেকে এই খ্যাতনামা দুই চিকিৎসকের সম্পর্কের আরও অবনতি ঘটে এবং তা প্রকাশ্য রূপ নেয়। সম্ভবত এই ব্যক্তিগত অথবা পেশাগত বৈরী সম্পর্কই ডাঃ বদরুদ্দোজা চৌধুরীকে ক্রমশঃ ভাসানী ন্যাপের এবং কাজী জাফরদের রাজনীতির দিকে ঠেলে দেয় এবং শেষ পর্যন্ত মাওলানা ভাসানীর অসংখ্য অনুরাগীর মতো ডাঃ বদরুদ্দোজা চৌধুরীকেও বিএনপি'র অসৎ ও অনিষ্টকর রাজনীতির আবর্তে আশ্রয় নিতে বাধ্য করে। তবে ব্যক্তিগতভাবে তিনি সৎ ও নিষ্ঠ ব্যক্তি বলেই হয়তো বিএনপি-রাজনীতির ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে 'বিশ্বাসভাজনদের' একজন হয়ে উঠতে পারেননি; বরং সেই ক্ষমতা বলয়ের চারপাশে উপগ্রহ (উপপ্রধানমন্ত্রী থেকে সংসদে সরকারী দলের উপনেতা) হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।"

বন্ধুবরের উপরোক্ত বিশ্লেষণটি বিশ্বাস করতে আমার কষ্ট হয়। কারণ, ডাঃ বদরুদ্দোজা চৌধুরীর মতো একজন শিক্ষিত ও মার্জিত রুচির ব্যক্তি কেবল ব্যক্তিগত বা পেশাগত ঝগড়া-কলহের জন্য নীতিহীন রাজনীতির তলানীর দিকে ঝুঁকবেন, তা বিশ্বাস করা কষ্টকর বৈকি। ডাঃ চৌধুরীর প্রয়াত পিতা কফিলউদ্দিন চৌধুরী ছিলেন রাজনীতিক। বাংলাদেশে

www.pathagar.com

পঞ্চাশের, ষাটের ও সত্তর দশকের রাজনীতিতে তার অবদান বিরাট। ষাটের দশকের মাঝামাঝি ছয়দফা আন্দোলনের সময়ে তার সঙ্গে আমার পরিচয় ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়। আন্দোলনের খবরাখবর জানার জন্য তিনি প্রায়ই আমাকে তার বাসায় ডাকতেন। তখন থেকেই তিনি আমাকে স্নেহ করতে শুরু করেন এবং আমিও তাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতে শুরু করি। '৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় আমরা যখন কলকাতায়, তখন (সম্ভবতঃ ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ ঘোষিত হওয়ার কিছু আগে) প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আমাকে ডেকে পাঠান এবং জানান, "কফিলউদ্দিন চৌধুরী মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়ার জন্য বর্ডার অতিক্রম করেছেন। তিনি কলকাতায় পৌঁছে আমাদের সঙ্গে বৈঠক সেরেই 'জয় বাংলা' পত্রিকা এবং স্বাধীন বাংলা বেতার মারফৎ একটি বিবৃতি প্রচার করতে চান। আপনাকে এই বিবৃতির মুসাবিদা তৈরি করতে হবে। তিনিও তাই চান। আপনার সঙ্গেই তিনি মন্ত্রিসভার বৈঠক থেকে বালু হাক্কাক লেনে (জয় বাংলা পত্রিকা অফিস) গিয়ে সকলের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতে ইচ্ছুক।"

বললাম ঃ তাঁর বিবৃতির মুসাবিদা তৈরি করা এমন কিছু কঠিন কাজ নয়। তিনি বলবেন আমি গুছিয়ে লিখে দেব। কিন্তু এই বয়সে, হার্টের ভয়ানক রোগ নিয়ে তিনি দেশে বাড়িঘর, বিপুল সম্পত্তি রেখে এক কাপড়ে বর্ডার অতিক্রম করেছেন, তা আমার বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না।

প্রধানমন্ত্রী বললেনঃ তিনি এখনই এখানে আসছেন। তার কাছেই আপনি সব কথা শুনবেন।

থিয়েটার রোডে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী বাসভবনে আমাকে দেখতে কফিলউদ্দিন চৌধুরী পরম স্নেহে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, বললেন, তুমি পালিয়ো না। আমি তাজউদ্দিনের সঙ্গে কথাবার্তা সেরে নেই। তারপর তোমার সঙ্গে বালু হাক্কাক লেনে যাব।

বালু হাক্কাক লেনে তখন নিয়মিত বসতেন আওয়ামী লীগের বর্তমান প্রবীন নেতা আবদুল মান্নান (টাঙ্গাইল) তিনি 'জয় বাংলা' পত্রিকার ও বেতারের তত্ত্বাবধানে ছিলেন। তার সঙ্গে ছিলেন জিল্লুর রহমান (বর্তমান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক) এবং চট্টগ্রামের 'দৈনিক আজাদী' পত্রিকার সম্পাদক অধ্যাপক খালেদ। কফিলউদ্দিন চৌধুরীকে তারা সকলেই শ্রদ্ধা করেন। বললাম, বালু হাক্কাক লেনে এরা ছাড়াও আরও অনেকের সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ হবে।

থিয়েটার রোড থেকে বালু হাক্কাক লেনে যাওয়ার পথে ট্যাক্সিতে বসে কফিলউদ্দিন চৌধুরীকে বললামঃ আপনি এই বৃদ্ধ বয়সে, হার্টের রোগ নিয়ে বর্ডার পার হয়েছেন। আপনার জীবনের ঝুঁকি ছিল, তা জানেন?

কফিলউদ্দিন চৌধুরী বললেন ঃ তা জানি।

www.pathagar.com

তবুও এলেন?

হ্যাঁ, এলাম। সারাজীবন রাজনীতি করেছি, মন্ত্রীত্ব করেছি। আজ দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ডাক দিয়েছে মুজিব। আমি ঘরে বসে থাকবো? ঘরে বসে হার্টের ব্যারামে মরার চাইতে, দেশের মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়ে মৃত্যুবরণ কি গৌরবের নয়?

বললাম ঃ আপনার ছেলেরা-- বিশেষ করে ডাঃ বদরুদ্দোজা তো একজন ডাক্তার। তিনি আপনাকে বর্ডার পার হয়ে আসতে দিলেন?

কফিলউদ্দিন চৌধুরী বললেনঃ আমি আসতে চাইলে আমার ছেলেরা কি করতে পারে? বদরুদ্দোজা আমার সঙ্গে বর্ডার পর্যন্ত এসেছে। তারপর ঢাকায় ফিরে গেছে।

খবরটা শুনে বিস্মিত হলাম। বললাম ঃ তিনি এলেন না কেন? কফিলউদ্দিন চৌধুরী বললেন ঃ আশা করছি দেশ একদিন মুক্ত হবে এবং আমার ছেলেরাও বেঁচে থাকবে। তোমার সঙ্গে তো বদরুদ্দোজার খাতির রয়েছে। দেশে ফিরে গিয়ে তাকেই কথাটা জিজ্ঞাসা কোর!

বালু হাক্কাক লেনে 'জয় বাংলা' পত্রিকা অফিসে পৌঁছে এই বয়োবৃদ্ধ নেতা আমার টেবিলের সামনের চেয়ারে বসলেন। বললেন ঃ লেখো। "বাংলাদেশ আজ পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর বর্বর পৈশাচিক হামলায় বিধ্বস্ত। এই হামলার বিরুদ্ধে ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলার ডাক দিয়েছিলেন শেখ মুজিব তার ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষনে। তিনি স্বাধীনতার ডাক দিয়েছেন। আবার ২৬শে মার্চ ঘোষণা করেছেন বাংলাদেশের পূর্ণ স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতার যুদ্ধে দলে দলে তরুণ আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরেরা আত্মাহুতি দিচ্ছে। আমরা বৃদ্ধের দল, যারা জীবনের পনর আনা সময় কাটিয়ে দিয়েছি, তারা কি ঘরে বসে এই সোনার ছেলেদের আত্মদানের নীরব নিষ্ক্রিয় দর্শক হয়ে বসে থাকবো? বরং আমরা প্রাণ দিয়ে যদি এই তরুণদের প্রাণ বাঁচাতে পারি, তাহলেই দেশ ও জাতির ভবিষ্যত রয়েছে। তাই আমি শেখ মুজিবের নেতৃত্বে, তার সরকারের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে এসেছি। আমাকে এ সরকার যেখানে, যে অবস্থায়, যে ভূমিকায় আমার শারীরিক সাধ্যমত কোনো কাজে লাগতে নির্দেশ দেবেন, আমি তা অবনত মস্তকে মেনে নেব।"

কফিলউদ্দিন চৌধুরীর দীর্ঘ বিবৃতির সবটা এত দীর্ঘদিন আমার মনে থাকার কথা নয়। কিন্তু তার মূল কথাগুলো এখনো মনে রয়েছে। আরও মনে রয়েছে, তিনি তার বিবৃতিতে বাংলাদেশে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর বর্বর হত্যালীলা ও ধ্বংসযজ্ঞের এক প্রামাণ্য চিত্র তুলে ধরেছিলেন।

কফিলউদ্দিন চৌধুরী আজ নেই। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি ঢাকায় ফিরে যান এবং সম্ভবতঃ হৃদরোগেই মারা যান। তারই ছেলে ডাঃ বদরুদ্দোজা চৌধুরী। একজন খ্যাতনামা

www.pathagar.com

ও জনপ্রিয় চিকিৎসক হওয়া সত্ত্বেও পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে তিনি রাজনীতিতে নেমে এসেছেন। কিন্তু প্রয়াত পিতার রাজনীতির ঐতিহ্য তিনি রক্ষা করতে পেরেছেন কি? নাকি তার রাজনৈতিক ঐতিহ্যের বিপরীত স্রোতে গা ভাসিয়েছেন? তাই কি তার অবস্থান আজ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শ বিরোধী চক্রের সমর্থনপুষ্ট সরকারের মঞ্চে? কণ্ঠে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ নামক অপজাতীয়তার ধ্বনি এবং এরই প্রভাবে কি তিনি একজন নিহত সামরিক ডিকটেটরের গায়ে 'গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদী দর্শনের' সেই অদৃশ্য (অস্তিত্বহীন) পোষাকটি এক রাজার সব স্তাবক সভাষদই দেখতে পেয়েছিলেন, কিন্তু এক নিরক্ষর রাখাল বালক দেখতে না পেয়ে চীৎকার করে উঠেছিল-- আমাদের রাজা ন্যাংটা, ওহো আমাদের রাজা ন্যাংটা।

আমার ধারণা, ডাঃ বদরুদ্দোজা চৌধুরীর মনে তার প্রয়াত পিতার রাজনৈতিক আদর্শ এবং তার বর্তমান মত ও পথ নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্ব রয়েছে। তাই মাঝে মাঝে তার কণ্ঠে উপকথায় বর্ণিত রাখাল বালকের সত্য ভাষণ শোনা যায়। কিন্তু এই সত্য ভাষণ অনেক সময়েই তলিয়ে যায় তার বর্তমান মত ও পথের বিভ্রান্তির আবর্তে। নভেম্বর মাসে নিউইয়র্কের প্রশ্নোত্তর সভায় ডাঃ চৌধুরীর কাছে প্রশ্ন করা হয়েছিল, '৭০ এর নির্বাচনে বাংলার মানুষ বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে ভোট দিয়েছে। এরপর কি উদ্দেশ্যে বিএনপি বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ চালু করেছে?" উত্তরে ডাঃ চৌধুরী বলেছেন, "ভাষা ও সংস্কৃতির নিরিখে নিঃসন্দেহে আমরা বাঙালী। কিন্তু আমাদের দেশের একটি ভৌগোলিক কাঠামো রয়েছে। এই ভৌগোলিক সীমারেখায় উপজাতিদেরও বাস। তারা জাতি হিসেবে বাঙালী নন। আমাদের ভাষা আন্দোলন হয়েছে, মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে। সর্বোপরি আমাদের ইতিহাস ঐতিহ্য রয়েছে। এই সমগ্র পরিচয়ে, সার্বিক পরিচয়ে আমরা বাংলাদেশী। তাই সামগ্রিকভাবে আমাদের জাতীয়তা বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ।" (সাপ্তাহিক প্রবাসী, নিউইয়ক, পৃষ্ঠা ১৫, ২৭ নভেম্বর, ১৯৯২)

ডাঃ চৌধুরীর চিকিৎসা শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি রয়েছে জানতাম; কিন্তু ইতিহাস, ভূগোল, ভাষা, সংস্কৃতি ও জাতিতত্ত্ব সম্পর্কিত শাস্ত্রেও তিনি এতবড় পন্ডিত লোক, তা আমি জানতাম না। আমি অল্পবিদ্যার সাংবাদিক। তাই তাকে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করি, ভাষা ও সংস্কৃতির নিরিখে আমরা যদি নিঃসন্দেহে বাঙালী হই এবং আমাদের দেশের ভৌগোলিক কাঠামো ও সীমা যাই হোক, দেশটির নাম যদি হয় বাংলাদেশ; তাহলে আমাদের হাজার বছরের বাঙালী পরিচয়ে পরিচিত হতে আপত্তিটা কোথায়? বাংলাদেশী এই ভূঁইফোড় পরিচয় সরকারিভাবে বাঙালীদের মাথায় চাপানোর অপচেষ্টা কেন? এই নামটি কি দেশের জনগণ আবিস্কার করেছে, না গ্রহণ করেছে? এটা কি একজন মিলিটারি শাসক কর্তৃক ক্ষমতা

www.pathagar.com

দখলের পর জনগণের ইচ্ছা অনিচ্ছার তোয়াক্কা না করে, হীন রাজনৈতিক স্বার্থে জনগণের মাথায় চাপিয়ে দেওয়া পরিচয় নয়? ডাঃ চৌধুরী ইতিহাস, ভূগোলের কথা বলেছেন। তিনি বাংলাদেশের এমন কি ভারত উপমহাদেশের গত এক হাজার বছরের ইতিহাসে কি বাংলাদেশী নাম বা পরিচয়ের কোনো উল্লেখ দেখাতে পারবেন? আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা অনুযায়ী বাংলাদেশ নামক ন্যাশন স্টেটের বয়স হতে পারে একুশ বছর। কিন্তু বর্তমান বাংলাদেশ বা পূর্ববঙ্গ তিন হাজার বছর আগেও যে বঙ্গ নামে পরিচিত ছিল, তিন হাজার বছরের পুরনো গ্রন্থ মহাভারত ও রামায়ণ খুললেও তিনি তা দেখতে পাবেন। মহাভারতে বলা হয়েছে, দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় বঙ্গের রাজা চন্দ্র সেন উপস্থিত হয়েছিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে বঙ্গের রাজা দুর্যোধনের পক্ষে যোগ দিয়েছিলেন। কোনো কোনো ঐতিহাসিক মনে করেন, বঙ্গরাজা যুদ্ধে পান্ডবদের পক্ষে যোগ না দেওয়াতেই প্রাণী বাংলাদেশকে পান্ডব বর্জিত দেশ আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। রামায়ণেও প্রাচীন বঙ্গের উল্লেখ দেখা যায়। অযোধ্যার রাজাদের সঙ্গে বঙ্গের রাজাদের বৈবাহিক সম্পর্কের কথাও রামায়ণে বলা হয়েছে। প্রাচীন বঙ্গ বা পূর্ব বঙ্গের লোকদের যে বাঙালী পরিচয়ও হাজার বছরের তা নিয়ে আমি এই ধারাবাহিক লেখার গোড়ার দিকে বিশদ আলোচনা করেছি। এখানে তার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গের বাংলা ভাষাভাষীদের সঙ্গে আমাদের বর্তমান পার্থক্য কোথায় তা নিয়েও আমি আগেই বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। এখানে আরও একটি কথা যোগ করতে চাই যে, অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতেই বাংলাদেশে বর্তমানে যাদের উপজাতি বলা হয়, তারাই আসলে আদি বাঙালী। বহিরাগত আর্থ, পাঠান, মোগল, ইংরেজ প্রভৃতি আক্রমণকারী ও দখলদার শক্তির মোকাবিলায় বাংলার আদি অধিবাসীরা তাদের অস্তিত্ব, সমাজ-সভ্যতা রক্ষার জন্য দেশের দুর্গম প্রত্যন্ত অঞ্চলে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং শত শত বছর ধরে অনুন্নত জীবন যাপনে বাধ্য হয়। আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, কান্ডা প্রভৃতি দেশেও প্রায় একই ধরনের ঘটনা ঘটতে দেখা গেছে। শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশবাদীরা এসব দেশে গিয়ে বসতি স্থাপন করেছে এবং আদি অধিবাসীদের উপর নির্মম হত্যাকান্ড, লুণ্ঠন চালিয়ে তাদের উর্বর জমি ও বসতি দখল করে, আদি অধিবাসীদের দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে গিয়ে আশ্রয় নিতে ও মানবেতর জীবন যাপনে বাধ্য করেছে। এই শ্বেতাঙ্গ বহিরাগতরা নিজেরা আমেরিকান, অষ্ট্রেলিয়ান, নিউজিল্যান্ডার আইত্যাদি নাম গ্রহণ করেছে এবং দেশগুলোর আদি অধিবাসীদের ব্লাক, রেড ইন্ডিয়ান, মাওরি প্রভৃতি কল্পিত ও সম্প্রদায়গত নামে চিহ্নিত করে রেখেছে। এই শ্বেতাঙ্গ বহিরাগতদের সঙ্গে বাংলাদেশের মুসলমান বহিরাগতদের একশ্রেণীর বংশধরের পার্থক্য এই যে, এই শেষোক্ত শ্রেণী নিজেদের বাঙালী বলে পরিচয় দিতে লজ্জা পান। তার একটা কারণ হয়তো এই যে,

www.pathagar.com

যদি অনুন্নত ও অচ্ছুৎ আদি বাঙালীদের সঙ্গে তাদের জাতিগত সম্পর্ক ও আত্মীয়তা কেউ আবিস্কার করে ফেলেন!

আমাদের প্রতিবেশী গণতান্ত্রিক ভারতেও তার আদি অধিবাসীদের একটা বৃহৎ অংশ এখনো অচ্ছুৎ, নির্মবর্ণের হিন্দু, তফসিলী ইত্যাদি পরিচয়ে চিহ্নিত হয়ে অনুন্নত, অত্যাচারিত, মানবেতর জীবনযাপন করছে। তাদের দাবি, মধ্যযুগীয় ঘৃন্য কাষ্ট সিস্টেম বা বর্ণভেদ প্রথা লোপ করে তাদের বর্ণ হিন্দুদের শ্রেণী ও বর্ণস্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে অচ্ছুতদের এই অধিকার দেননি। চালাকি করে তিনি তাদের নতুন নাম দিয়েছিলেন 'হরিজন'। এই নাম বদল দ্বারা তাদের সামাজিক ষ্ট্যাটাসের কোনো পরিবর্তন ও উন্নয়ন ঘটেনি। বরং নতুন নাম নিয়েও তারা অচ্ছুতই রয়ে গেছেন। ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগের সময় যে কয়েক লাখ 'বিহারী' তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে এসে বসতি স্থাপন করেন, পাকিস্তানী শাসকেরা নিজেদের ক্ষমতার স্বার্থে ব্যবহার করার জন্য তাদের বাঙালীদের সঙ্গে মিশে যেতে দেননি। তাদের 'মোহাজের' নাম দিয়ে একটি আলাদা সম্প্রদায় হিসেবে বিচ্ছিন্নভাবে টিকিয়ে রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন। বৃটিশ ভারতে ইংরেজ শাসকেরা যেমন 'এ্যাংলো ইন্ডিয়াদের' ইন্ডিয়ান হতে না দিয়ে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছেন, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানেও পাকিস্তানের শাসকেরা মওলানা রাগীব আহসানের নেতৃত্বে একটি আলাদা মোহাজের সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ঘটান। পরবর্তীকালে এই মোহাজেরদের একটা বিরাট অংশকে বিভ্রান্ত করে বাঙ্গালীরা ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে স্বাধীনতা যুদ্ধ পর্যন্ত সকল আন্দোলনে 'শাসকদের আশ্রিত শক্তি' হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান দুদেশেরই 'বিহারী সম্প্রদায়ের' যে সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করেছে তার একটা বড় কারণ ভারত ভাগের পর থেকে পাকিস্তানী শাসক শ্রেণী কর্তৃক অনুসৃত তথাকথিত মোহাজের নীতি।

নিউইয়র্কের প্রশ্নোত্তর সভায় বাংলাদেশের 'উপজাতিদের' সম্পর্কে ডাঃ বদরুদ্দোজা চৌধুরীর মন্তব্যের একটি বিপজ্জনক দিকও রয়েছে। তিনি বলেছেন, 'এই উপজাতিসমূহ বাঙালী নন।' তাহলে কি ধরে নিতে হবে, বাংলাদেশের দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে যে পার্বত্য উপজাতিসমূহের বাস, তারা স্বতন্ত্র জাতি সত্তার ভিত্তিতে যদি বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন শুরু করতে চান, তাকে ডাঃ চৌধুরী বা বিএনপি সরকার সমর্থন জানাবেন?

আসলে ডাঃ বদরুদ্দোজা ন্যাশনালিটি এবং সিটিজেনশিপ বা জাতীয়তা ও নাগরিকত্বের প্রশ্নটি গুলিয়ে ফেলেছেন। জাতীয়তা অর্জন করা যায় না বা পরিবর্তন করাও যায় না। নাগরিকত্ব অর্জন করা যায়, পরিবর্তন করাও যায়। জাতীয়তা জন্ম, বংশ এবং আবহমান ইতিহাস, ভূগোল, ভাষা ও ঐতিহ্যসূত্রে গ্রথিত। নাগরিকত্ব ব্যক্তি বিশেষের গ্রহণ বর্জনের

www.pathagar.com

ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। আমি ইচ্ছা করলেই ইংরেজ, আইরিশ অথবা স্কটিশ জাতীয়তা গ্রহণ করতে পারি না, নিজেকে ইংরেজ বা আইরিশ বলে পরিচয় দিতে পারি না; কিন্তু এই তিনটি দেশ মিলে যে বৃটেন বা ইউনাইটেড কিংডম, তার নাগরিকত্ব গ্রহণ করে বৃটিশ বলে পরিচয় দিতে পারি। বৃটিশ নাগরিক পরিচয়ের অধিকারী হওয়ায় কোনো ইংরেজ, আইরিশ, ওয়েলস বা স্কটিশ নিজের জাতি পরিচয় মুছে ফেলেননি। কোনো স্কটিশকে ইংলিশ বলা হলে তিনি রীতিমতো ক্রুদ্ধ হন; গর্বের সঙ্গে বলেন, "আমি স্কটিশ। নাগরিক পরিচয়ে আমি বৃটিশ।" তর্কের খাতিরে যদি ধরে নেওয়া যায়, বাংলাদেশ একটি মাল্টিন্যাশনাল দেশ, তাহলেও সংখ্যাগরিষ্ট বাঙালী জাতির বাঙালী জাতি পরিচয় মুছে ফেলার দরকার নেই। নাগরিক পরিচয়ে তিনি বাংলাদেশী হতে পারেন, কিন্তু তার জাতীয়তা বাঙালী। জাতীয়তাবাদও বাঙালী তবে আমার মতে, আমেরিকানদের মতো আমাদেরও সার্বিক ও সামগ্রিক পরিচয় বাঙালী হওয়া উচিত। আমেরিকা একটি মহাদেশ। সেখানে বহু ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায় ও জাতির বাস। দেশটির নাম তাই ইউনাইটেড ষ্টেটস্ অব আমেরিকা। সকল নাগরিকের সার্বিক ও সামগ্রিক পরিচয়ও আমেরিকান। বাংলাদেশে সকল ধর্ম, বর্ণ ও সম্প্রদায়ের লোক বাঙালী নাগরিক পরিচয়ে চিহ্নিত হলে ক্ষতি নেই। বরং সকল নাগরিকের জন্য সমানাধিকার প্রতিষ্ঠায় এটাই সর্বোত্তম পন্থা।

ডাঃ বদরুদ্দোজা চৌধুরীর বিএনপি দল বাংলাদেশের অনুন্নত সম্প্রদায়গুলোর স্বার্থে 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ' প্রতিষ্ঠা করতে চান, এটা কেউ ভাবলে বলবো, তিনি বোকার স্বর্গে বাস করছেন। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের প্রচার চালানো হচ্ছে বাঙালী জাতীয়তাবাদের পাল্টা তত্ত্ব হিসেবে, নির্দোষ নাগরিক পরিচয় হিসেবে নয়। উদ্দেশ্য, ডাঃ চৌধুরী কর্তৃক বর্ণিত 'বাঙালীর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত' সকল আন্দোলনে বাঙালীর জাতীয়তাবোধ ভিত্তিক যে মুক্তি চেতনা কাজ করেছে তার ধ্বংস সাধন করা এবং তার ইতিহাস ঐতিহ্যকেও মুছে ফেলা। তা না হলে পাকিস্তানী শাসকদের মতো বিএনপি'র নেতারা বাঙালী পরিচয় সম্পর্কে এত শঙ্কাবোধ করতেন না; বাংলাদেশী জাতীয়তার তত্ত্ব প্রচার করতে গিয়ে বাঙালী জাতীয়তাবাদের উপর আক্রমণ চালাতেন না। বৃটেনের কোনো ইংরেজ তার বৃটিশ নাগরিক পরিচয়কে তার ইংলিশ জাতীয়তা, ভাষা ও কালচারের শত্রু মনে করেন না। কিন্তু ডাঃ চৌধুরীর দল বাঙালীর বাঙালী- পরিচয়ের গন্ধ পেলেই আঁতকে ওঠেন এবং বাঙালী জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধংদেহী মনোভাব গ্রহণ করেন। এর আসল কারণ কি তা 'বুঝহ লোক যে জানহ সন্ধান'। আমার অধিক ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। (অসমাপ্ত) ১৬ ডিসেম্বর (বিজয় দিবস) '৯২ লন্ডন।

www.pathagar.com

What next?

Editor

Holiday, 23 February 1969

President Ayub Khan's dramatic renunciation of power was followed, in less than twenty-four hours, by the equally dramatic withdrawal of the 'Agartala Conspiracy Case' and the release of Sheikh Mujibur Rahman. These two events are significant milestones in the history of the struggle of the people of Pakistan. In themselves, they are eloquent enough testimony to the invincibility of the people's will. In the context of the present situation, the blood that flowed and the guns that roared from Pabna to Pindi symbolise the regime's eventual recognition of the reality obtaining in Pakistan today.

Yet the regime's surrender is nowhere near absolute. President Ayub has announced his intention to step down from office. He has said nothing about dismantling the huge and hugely corrupt and inept system that has been built up in the dark decade. He has expressed his desire to iron out the country's problems with the active participation of the opposition failing which he would present his unilateral proposals to the National Assembly. He has given no indication either of the nature and agenda of the talks with the opposition nor defined what form his unilateral proposals are to take. Apart from the possibility of restoring universal adult franchise in the country, the proposed amendments remain a big question mark. Sheikh Mujib's release is a special triumph for the people of East Pakistan. It was their unrelenting determination to fight for this release that finally won the day against a reluctant regime. It was their movement which convinced the rulers that nothing else would do but to release him and others and drop the alleged conspiracy trial.

However, we should not at this moment lose sight of the prime objectives. The regime is beaten, but it is far from being vanquished. All its trappings remain and so does its capability to connive and intrigue against the people. It will not allow itself to surrender totally without a last ditch

www.pathagar.com

attempt to perpetuate its system in some form or the other and to serve vested interests both within and outside the country. It has many tricks up its sleeve. It will undoubtedly make subtle and clever attempts to split the opposition, drive a wedge between the major political parties and line up one section against another. It may also invoke the name of Islam to divide the people. It has many lures to dangle before the opposition leaders, some of them being too tempting to be refused.

Now more than ever, at this crucial juncture of history, it is necessary for all the democratic forces of the country to unite and form a common front against the pressures that are to come. The battle will be fought on two fronts against the regime and against the forces of reaction. It is here that the ultimate test lies. It will be a test for both of the integrity of the leaders and the strength of their respective parties. The party has yet to emerge in this country that can face and overcome this two-pronged onslaught in both wings of the country. The moment is at hand when the progressive forces must band together to defend the people's rights and to carry the fight into the opponent's camp. They bear the heavy responsibility of fulfilling the peoples aspirations and they must forge strong bounds of unity amongst themselves to be able to reach the goal. Nothing less than the destiny of this nation is at stake. Any faltering now will gravely affect the course of future events.

The coming days will be trying ones for all. The people would be looking forward eagerly for the beginning of their salvation. The leaders themselves would be on trial. The moment of truth in not far off. Let us hope all democratic and patriotic forces remain steadfast and true to the country and the people.

www.pathagar.com

NATO Is Vital for the Challenges of the New Century

By R. Nicholas Burns

BRUSSELS — As Europeans and Americans alike remember war heroes on Armistice and Veterans Day, we remember, too, the distance the United States and its allies have traveled across the last half century. From the ravages of World War II rose the NATO alliance, binding 12 nations (now 19) together to win the Cold War, defeat the Soviet Union, bring peace to the Balkans and today to help face down the terrorist threat to us all.

Two historic ironies are worth savoring on this Nov. 11. First, the alliance created 52 years ago for the United States to defend Europe from Soviet aggression invoked its mutual defense clause for the first time only two months ago for Europe to help defend the United States against terrorist aggression.

And second, that just a decade ago, pundits on both sides of the Atlantic were predicting NATO would wither and die, since its collective defense mission seemed complete with the defeat of the Soviet Union. Today, we take a lesson from the shortsightedness and complacency of those who sold the Alliance short: To keep us all safe, Europe and North America need NATO now more than ever.

When President George W. Bush and the American people awoke on Sept. 12, still stunned by the terrorist attacks in New York and Washington, NATO had already acted, invoking for the first time in alliance history Article 5 of the 1949 Washington Treaty — the clause that declares an attack on one is an attack on all. That act surprised and gratified the American people, many of whom had come to think of their country as so invulnerable that they might no longer need Allies to help defend them.

It also sent a powerful signal to the terrorists that, whether they intended to or not, they had now taken us all on — because we Americans and our allies stand united against them.

The NATO allies quickly agreed to a series of collective measures to help the U.S. military topple the Taliban and destroy the Qaida terrorist network. NATO countries granted blanket over flight clearance for allied aircraft involved in the terrorism fight. They made all ports, airfields, and refueling depots available to allied forces. They also agreed to share intelligence.

Today, NATO AWACs flown by European crews circle above the continental United States, helping to defend Americans from new terrorist attacks. As we began the military campaign in Afghanistan, allies offered special forces units, fighter aircraft, naval vessels and logistics help.

In Europe, NATO also needs to keep its focus on other challenges to complete the dream of a continent whole, free, and at peace. NATO must pursue four specific and critically important aims.

First, NATO must finish the job of bringing stability to the Balkans. In Bosnia, Kosovo, and Macedonia, the United States will remain with NATO, fully engaged militarily and politically, to staunch the kind of instability that let terrorists take root in Afghanistan.

Second is a new relationship with Russia. When presidents Bush and Vladimir Putin meet this week in Washington and in Crawford, Texas, they will discuss ways to leverage our collaboration on terrorism into other security areas, including deepening NATO-Russia cooperation.

Third, it is necessary to strengthen NATO's capabilities to meet new challenges. A fundamental lesson of Sept. 11 is to continue missile defense testing and research to defend Europe and America from terrorists and rogue states.

Finally, Sept. 11 also demands that we expand NATO to consolidate democracy eastward and southward. The United States will support a vigorous round of enlargement next year.

Far from being an irrelevant anachronism of the 20th century, NATO thrives into the 21st. With the battle against terrorism now engaged, it is difficult to imagine a future without the alliance at the core of efforts to defend our civilization. Just as we vanquished fascism and Soviet communism, Europe and America alike can face this new threat of terrorism, confident that, with NATO's help, we will prevail.

The writer is U.S. ambassador to NATO. He contributed this comment to the International Herald Tribune.

www.pathagar.com

সাংবাদিকতার পরিভাষা

এবিসি (ABC) অডিট ব্যুরো অব সার্কুলেশন এর সংক্ষিপ্ত রূপ। এবিসি সংবাদপত্রের সার্কুলেশন বা প্রচার সংখ্যা নিরূপণ করে।

এ্যাডভান্স (Advance) ভবিষ্যতে ঘটতে পারে এমন আশঙ্কায় সতর্কতামূলক লেখা, আগাম রিপোর্ট অথবা সম্পাদকীয়।

অ্যাঙ্গেল (Angle) অ্যাঙ্গেল হলো কোনো সংবাদের নির্দিষ্ট দিক। কোনো ঘটনার একাধিক দিক থাকতে পারে। রিপোর্টার তার সংবাদপত্রের নীতিমালা অনুসারে যে সুনির্দিষ্ট দিক নিয়ে রিপোর্ট করে থাকেন তাকে অ্যাঙ্গেল বলে।

ব্যাংক (Bank) শিরোনামের নিচের ভাগকে ব্যাংক বলে। অর্থ্যাৎ যদি শিরোনামে দুটি অংশ থাকে তবে নিচের অংশকে ব্যাংক বলে।

বডি টাইপ (Body Type) যে টাইপ বা হরফে সাধারণত সংবাদ কাহিনীর শরীর, নির্মাণ করা হয় বয়েল ডাউন (Boil Down) সংবাদের কপি কাঁটছাট করাকে বয়েল ডাউন বলে।

ক্রেডিট লাইন (Credit Line) তথ্যের বিভিন্ন উৎস থাকতে পারে সংবাদ কাহিনীতে সেই উৎসের নাম উল্লেখ করাকে বলে ক্রেডিট লাইন।

কালার (Colour) কোনো সংবাদ, উপ-সম্পাদকীয় অথবা কলামে ভাষাগত বা তথ্যগত অলংকরণকে কালার বলে।

www.pathagar.com

ক্রুসেড (Crusade) ক্রুসেড শব্দের আভিধানিক অর্থ ধর্মযুদ্ধ। সামাজিক কোনো সংস্কার বা কোন ইস্যুতে সংবাদপত্র যদি আন্দোলন চালায় তবে তাকে সাংবাদিকতার ভাষায় ক্রুসেড বলে।

ক্রাউড কমপেলার (Crowd Compeller) ক্রাউড কমপেলার হলেন সে ধরনের নেতা যারা একটি সুদূর লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য বড় কোনো পরিকল্পনা হাতে নেন। তারা এ লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য জনগণকে পরিচালনা করে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে জনগণের জন্য নয় বরং তার লক্ষ্যে পৌছানোর জন্যই তারা কাজ করে থাকেন।

ক্রাউড এক্সপোনেন্ট (Crowd exponent) জননন্দিত নেতা, যিনি জনগণের অনুভূতিকে বোঝেন ও তাদের পক্ষে কথা বলেন, যার শক্তির মূল উৎস জনগণ।

ডেড লাইন (Dead line) সংবাদপত্রের বেধে দেয়া চূড়ান্ত সময়, যার মধ্যে লেখা শেষ করতে হবে। নির্দিষ্ট এই সময়ের পর কম্পোজ বিভাগ কোনো কপি প্রকাশের জন্য গ্রহণ করে না।

ডি নোট (D'note) সরকারের এক ধরনের নিষেধাজ্ঞামূলক পরামর্শ। সংবাদ হওয়ার যোগ্য এ ধরনের ঘটনা সম্পর্কে তথ্য অধিদপ্তর সংবাদপত্রকে ডিনোট এর মাধ্যমে পরামর্শ দেয়, তোমরা এটা দেশের স্বার্থে ছাপিও না।

তথ্য-নির্দেশ

১. Editorial Thinking and Writing- By Chilton R. Bush, Published by Greenwood publication (1970)

২. The Editorial Page, Edited by Laura Longley Babb, The Washington Post, Writers Group (1977)

৩. The Why Who and how of the editorial page – By Kenneth Rystrom, Published by-Random House (1983)

৪. Public opinion-by Walter Lippmann published by – Harcourt, Brace and company (1922).

৫. Principles of Editorial Writing- By Curtis D. MacdougAll, Published by W.C.Brown company (1973).

www.pathagar.com

৬. Editorial Silence: The Third era in journalism-by: Robert T morris, Published by – stratford company, Boston (1929)

৭. সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বনাম সাংবাদিকতা - সন্তোষ গুপ্ত

৮. সংবাদপত্রে প্রকাশিত সম্পাদকীয় : ধারা ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ, গবেষণা পত্র (৯৯-২০০০) - সীমা মোসলেম, গবেষণা ও তথ্য সংরক্ষণ বিভাগ, বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট।

৯. নিরীক্ষা- সেপ্টেম্বর, ডিসেম্বর '৮০ - বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট।

১০. তৃণমূল সাংবাদিকতা ঃ ধারণা ও কলা-কৌশল - সম্পাদনা জগদীশ সানা, মীর মাসরুর জামান

১১. Editorial Cartooning- By Richard Spencer, Published by-Iowa state college press (1949)

১২. Editor and Editorial Writing – By A. Gayle Waldrop, published by – W.C. Brown company Dubuque Iowa (1967)

www.pathagar.com

ম্যাস্-লাইন মিডিয়া সেন্টার (এমএমসি)

১/২০, হুমায়ূন রোড, ব্লক-বি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

ফোন : ৯১২৫০৭৭, ৮১২৩৪৪৬ ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৯১২১৬২৭

E-mail: massline@bangla.net